শুকতারা

৫৫
চতুর্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ • ১৪০৯
১০.০০

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - লাইব্রেরী
স্ক্যান করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম
এডিট করেছেন - পৌষালী পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা
স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

চুল কালো করুন নিরাপদে

সুপার ভাসমল ৩৩ কেশ কালা আয়ুরপ্রাশের গুণে সমৃদ্ধ,
যা কেবল আপনার চুলকে প্রাকৃতিক উপায়ে কালোই করে না,
গোড়া থেকে মজবুতও করে। যেখানে বেশীরভাগ
সাধারণ হেয়ার ডাইতে ক্ষতিকারক কেমিক্যাল থাকে এবং
তা আপনার চুলের ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং আয়ুরপ্রাশ
সমৃদ্ধ সুপার ভাসমল ৩৩ কেশ কালা ব্যবহার করুন এবং চুল
পড়ে যাবার ঝুঁকি না নিয়ে আপনার চুলকে কালো করুন।

এখন ন্যাচারল ব্রাউনও পাওয়া যায়।

সুপার
ভাসমল®
৩৩
আয়ুরপ্রাশ যুক্ত

কেশ কালা

আয়ুরপ্রাশের গুণে সমৃদ্ধ

For free literature write to Hygienic Research Institute, P. O. Box No. 12018, Andheri (W), Mumbai - 400 053. E-mail: vasmol@bom3.vsnl.net.in Website: www.hriindia.com

Situations/HRI/16/2002 Ben

বাঁটুল দি গ্রেট

ঘরের কাছেই বেড়ানোর এতো সুন্দর জায়গা, কতো শান্ত আর নিরিবিলি, তোরা কি বলিস?
ঠিকই বলেছো, বাঁটুলদা।
কিন্তু একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে, বাঁটুলদা।
আপনারা এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন কেন?
প্রাণে বাঁচতে চাও তো তোমরাও ছোটো। যমদূতেরা ভাঙচুর করে তেড়ে আসছে।
যমদূত! তারা আবার কারা?
হাতির পাল। সব ভাঙচুর করে এদিকেই তেড়ে আসছে।
এই সময়-
আপনারা পালাবেন না, থামুন। হাতিদের শায়েস্তা করতে আমি বনদপ্তর থেকে আসছি।
আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?
তুমি গিয়ে কি করবে! এটা নিয়ে আমি একাই একশো।
যাক, আর আমাদের কোন ভয় নেই। বনদপ্তর থেকে বন্দুকধারী এসে গেছেন, এবার হাতির পাল শায়েস্তা হবে।
একটু পরেই-
গুড়ুম!
বন্দুকের শব্দেই বোঝা যাচ্ছে বন্দুকধারী সফল। যাক বিপদ কাটলো তাহলে!
পরে-
ওরে গেছিরে!
মরেচে! মনে হয় হাতি শুঁড়ে জড়িয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে!
আমাদের রক্ষাকর্তার যদি এই হাল তাহলে আমাদের কি হবে!

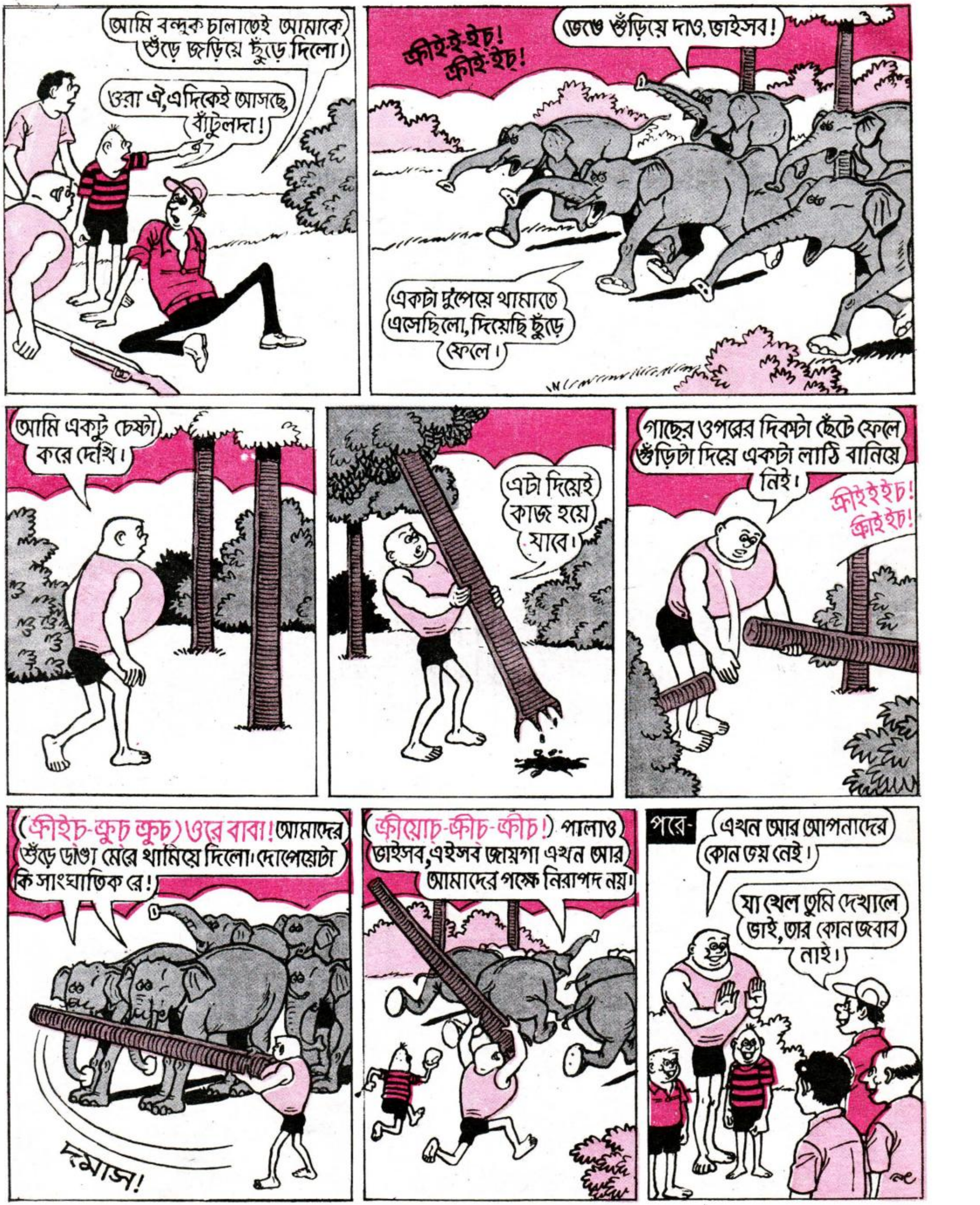
আমি বন্দুক চালাতেই আমাকে শুঁড়ে জড়িয়ে ছুঁড়ে দিলো।
ওরা ঐ,এদিকেই আসছে, বাঁটুলদা!
ক্রীই-ই-ইচ! ক্রীই-ইচ!
ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও,ভাইসব!
একটা দু'পেয়ে থামাতে এসেছিলো,দিয়েছি ছুঁড়ে ফেলে।
আমি একটু চেষ্টা করে দেখি।
এটা দিয়েই কাজ হয়ে যাবে।
গাছের ওপরের দিকটা ছেঁটে ফেলে গুঁড়িটা দিয়ে একটা লাঠি বানিয়ে নিই।
ক্রীইইইচ! ক্রীইইচ!
(ক্রীইচ-ক্রুচ ক্রুচ) ওরে বাবা! আমাদের শুঁড়ে ডাণ্ডা মেরে থামিয়ে দিলো। দোপেয়েটা কি সাংঘাতিক রে!
দমাস!
(ক্রীয়োচ-ক্রীচ-ক্রীচ!) পালাও ভাইসব,এইসব জায়গা এখন আর আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।
পরে-
এখন আর আপনাদের কোন ভয় নেই।
যা খেল তুমি দেখালে ভাই,তার কোন জবাব নাই।

সূচীপত্র

৮

আবার হুমকি দেওয়া চিঠি। কর্নেল ফিরে আসেন নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। মিলিয়ে দেখেন সেচবাংলোয় পাওয়া চিঠির সঙ্গে। দুটোই একই লোকের লেখা। সে কি জাহাজিবাবু? ইতিমধ্যে হালদারমশাইও আসেন চমকপ্রদ খবর নিয়ে। সেখানেও সেই শম্ভুনাথ চৌধুরি ওরফে জাহাজিবাবুর কীর্তি-কাহিনী। কে এতদিন বাদে ফলো করছে প্রাক্তন এক জাহাজের কাপ্টেনকে? কী তার উদ্দেশ্য? মর্মোদ্ধার হয় কি পার্চমেন্টে লেখা লিপির? দমবন্ধ করা উত্তেজনায় ভরপুর **সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের** ধারাবাহিক উপন্যাস **তিতলিপুরের জঙ্গলে।**

২২

খিড়কির দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়ে দুই বন্ধু। মস্ত বড় বাড়ি। কত ঘর, দরজা, দালান, কিন্তু সব ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ কানে আসে শব্দ—হুঁ হুঁ, চি চি! মানুষের? না..... ফিরে দেখায় **আশাপূর্ণা দেবীর গল্প চোরের আবার ভূতের ভয়!**

৫৪

বনের মধ্যে অন্ধকারে দিশাহারা হয়ে পড়ে হোমস। কোনদিকে যাবে সে? থেমে থাকলে তো চলবে না। প্রতি মুহূর্তে পরমা যে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত পারল কি হোমস পরমাকে বাঁচাতে? জানতে হলে পড়ো **রণেন বসুর** লেখা **কাপালিকেরা আজও নরবলি দেয়।**

Approved by the Directorate of Public Instruction West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide Memo No. 456 (17) T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য হাতে নিলে ১১০ টাকা, ডাকে ঃ বুকপোস্টে ১৫০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ৩২৫ টাকা।

Annual Subscription : UK and USA—By Air Mail Rs. 645.00.

R.N.I Registration No. 2621/57

ফোননং ঃ ৩৫০-৪২৯৪, ৩৫০-৪২৯৫, ৩৫০-৭৮৮৭

ই-মেল নং ঃ devsahitya@caltiger.com

মূল্য ঃ দশ টাক

বাকি সূচী

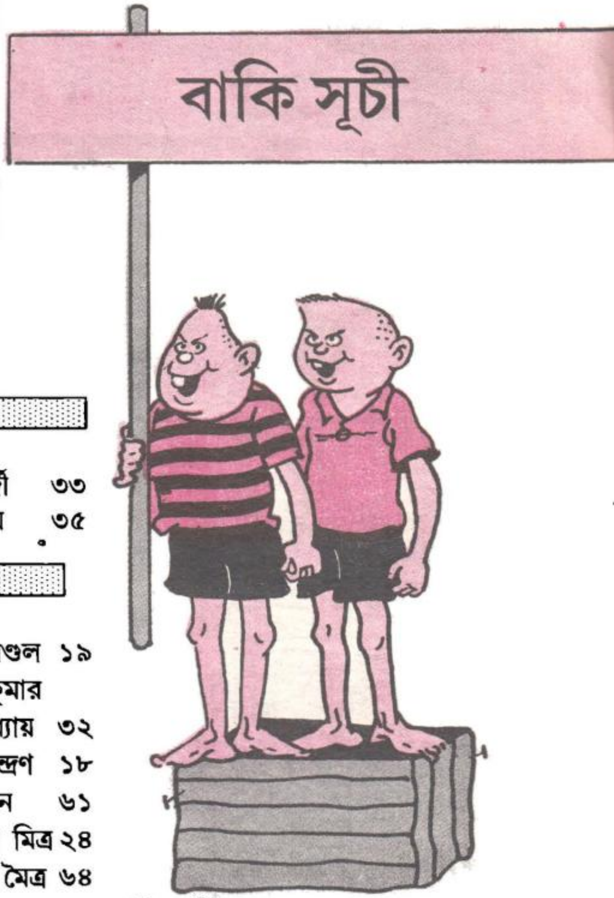

৩৮

সুজনের প্রাণ-ছোঁয়া ডাকে সাড়া দেন ঠাকুর। আবির্ভূত হয়ে বলেন, কূজন যেমন তোমায় বেগার খাটিয়ে নিজের ছেলেদের মানুষ করে নিয়েছে তেমনি পরজন্মে তুমিও ওকে বেগার খাটাবার সুযোগ পাবে। কে এই সুজন-কূজন? সুনীতি মুখোপাধ্যায়ের **কোকিল কেন কাকের বাসায়** গল্পে পাবে তাদের পরিচয়।

১২

পাটাইয়ের গলার স্বর শুনে চমকে ওঠে সবিতা। কোথায় এ ভাষা শিখলো পাটাই? আরো আশ্চর্য হয় যখন বন্ধ দরজা একটানে খুলে ফেলে তার ভাই। শিপ্রা মুখোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্প **চিলেকোঠার ভূত।**

৬৮

তিন কুমারকে উদ্দেশ করে রাজা বলেন, রাজ্য না হয় তিন ভাগ করা যাবে কিন্তু মুকুটটা? ওটা তো আর ভাগ করা যায় না, তাই অনেক ভাবনা-চিন্তার পর মাথায় একটা মতলব এসেছে। রাজামশাইয়ের মতলব কী করে হাসিল হলো তাই নিয়েই ডঃ উৎপল হোম রায়ের রূপকথা **সোনার পাখির সন্ধানে।**

আরও গল্প

বিচার—জীবনময় গুহ ৬
মন্ত্রশক্তি—পীযূষকান্তি বিশ্বাস ৭১
বিচিত্র ডাকাতি —শ্যামাপদ কর্মকার ৬৬
শিশু ভক্ত—অনুকূল মণ্ডল ৫০

পুরস্কৃত গল্প

একতার জয় (প্রথম) —কৃষ্ণদাস চ্যাটার্জী ৩৩
সুফল (দ্বিতীয়)—বিকাশ রায় ৩৫

ফিচার

দাদাঠাকুরের রসিকতা — ডঃ অর্চনা মণ্ডল ১৯
গল্প হলেও সত্যি—তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২
কেরিয়ার গাইড—ডি. এ. চন্দ্রণ ১৮
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ৬১
জানা-অজানা—প্রদীপ কুমার মিত্র ২৪
বিচিত্র খবর—প্রবীর কুমার মৈত্র ৬৪

ক্রীড়াঙ্গন

খেলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১
উঠছে যারা—বীরু বসু ৪৮
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম —তুষার শীল ৪৯

কবিতা ও ছড়া

গাছ বিরিঞ্চি—কৃষ্ণ ধর ৫
সেজ পিসির মেজ ছেলে —হরিসাধন চন্দ্র ৬৫
ঝড়ের আশা—প্রণব সেন ৬৫
প্যাঁচার ইস্কুল—আশিস কুমার মুখোপাধ্যায় ৬৫
হারমোনিয়াম—সতীশ বিশ্বাস ৬৫
টাক নিয়ে টুকটাক — প্রশান্ত বর্মন রায় ৬৫

বিভাগীয় লেখা

চিঠিপত্র ৩৭
মনের জানলা—জগদিন্দ্র মণ্ডল ২১
আমরা বলছি ২৮
দাদুমণির চিঠি ২৫
তোমাদের পাতা ২৬
মজার পাতা ৬২

ছবিতে গল্প

বাঁটুল দি গ্রেট —নারায়ণ দেবনাথ ১
হাঁদা-ভোঁদা —নারায়ণ দেবনাথ ৩০
কার্টুন—সুফি ৫৩
প্রচ্ছদ : খুনে বিজ্ঞানীর দ্বীপে —নারায়ণ দেবনাথ

ঘোষণা

বলাইচাঁদ সেন স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৩৬
জানো কী! ৩৪

গাছ বিরিক্ষি

কৃষ্ণ ধর

সবাই জানে গাছেরা সব বোবা
কিন্তু তারা নয়তো হাবাগোবা।
বাতাসে তার নাচে পাতা
কী অপরূপ শ্যামলতা
চোখ যে জুড়ায় দেখে ফুলের শোভা।

গাছ আমাদের বন্ধু বলেই জানি
তাকে আমরা পড়শী বলে মানি
গ্রাম শহরকে দেয় পাহারা
আনে বৃষ্টি, হটায় খরা
গাছ না হলে বাঁচবে না ধরণী।

ছবি : সুফি

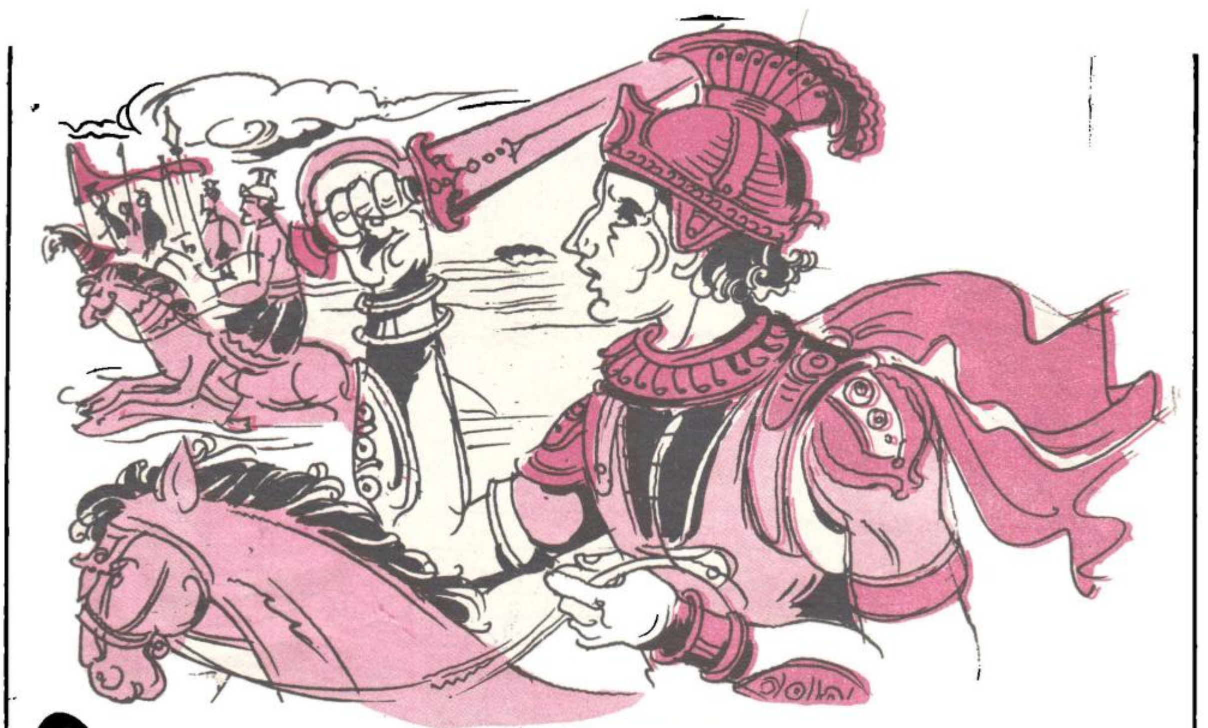

বিচার

জীবনময় গুহ

দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছেন ভারতবর্ষ অভিযানে। পথে এক বেগবতী নদী পেরোবার জন্য তাঁকে থামতে হয় কয়েকদিনের জন্য। তাঁবু পড়ল জঙ্গলের ধারে।

অঞ্চলটি ছিল এক উপজাতি রাজ্যের অধীন। উপজাতি-প্রধান আলেকজান্ডারের আগমন ও অবস্থানের কথা জানতে পেরে বিশ্ববিজয়ী বীরকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর গৃহে। কৌতূহলী আলেকজান্ডার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, উপস্থিত হলেন উপজাতি-প্রধানের বাড়িতে। সম্মানীয় বীর অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে উপজাতি-প্রধান মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন করেন। পরিবেশন-কারীরা আলেজান্ডারের সামনে এনে রাখে এক থালা সোনার নির্মিত খাবার। বিস্মিত আলেকজান্ডার প্রশ্ন করেন, 'একী! সোনার খাবার কেন? আপনারা কি এখানে সকলে সোনার খাবার খেয়ে থাকেন?' জবাবে প্রধান বলেন, 'না সম্রাট, আমরা সোনার খাবার খাই না। স্বাভাবিক খাবারই খাই।'

'তবে আমাকে কেন সোনার খাবার দিলেন?'

'ভাবলাম, আপনার মতো বিরাট দিগ্বিজয়ী বীরকে সোনার খাবার না দিলে, যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হবে না, আপনিও সন্তুষ্ট হবেন না।'

'তা কেন?' আলেকজান্ডার লজ্জিত হয়ে বললেন, 'না না প্রধান, আপনার কাছ থেকে আমি সোনার খাবার চাই না। আপনাদের স্বাভাবিক খাবারই আমাকে দিন।'

সর্দারের নির্দেশে আলেকজান্ডারকে উপজাতীয়দের স্বাভাবিক খাদ্য পরিবেশন করা হলো। ভোজনপর্বের শেষে আলাপ-চারিতার মাঝে আলেকজান্ডার উপজাতি-প্রধানের কাছ থেকে সে দেশের নিয়মনীতি এবং শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এমন সময় দ্বাররক্ষী এসে জানায়, দু'জন গ্রাম্য প্রজা বিচারপ্রার্থী হয়ে এসেছে প্রধানের কাছে। প্রধান আলেকজান্ডারকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের প্রাঙ্গণে এসে বসলেন।

প্রজাদের মধ্যে একজন অভিযোগ জানিয়ে বলে, 'হুজুর, আমি এই সঙ্গী গ্রামবাসীর কাছে এক খণ্ড জমি বিক্রি করেছিলাম। সেই জমি চাষ করার সময় এই ব্যক্তি মাটির নিচে এক ঘড়া সোনার মোহর পায়। ঘড়াসুদ্ধ সেই মোহর সে আমার কাছে নিয়ে আসে গ্রহণ করার জন্য। আমি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করি।'

'কারণ?'

'আমি এই ব্যক্তিকে জমি বিক্রি করেছি, জমির সব স্বত্ব দিয়েছি। বিক্রির পর ঐ জমিতে আমার কোনো অধিকার নেই।'

দ্বিতীয় অভিযোগকারী বলে, 'হুজুর, অর্থ দিয়ে আমি এই ব্যক্তির জমি কিনেছি। জমির নিচে সঞ্চিত সম্পদ কিনিনি। এই সম্পদের উপর আমার কোনো অধিকার নেই। তাই পুরনো মালিককে এই সম্পদ ফিরিয়ে দিতে চাই।'

'কারণ?'

'যে সম্পদের অধিকারী আমি নই, সে সম্পদ কীভাবে আমি নিজের কাছে রাখি, বলুন?'

অপর ব্যক্তি বলল, 'হুজুর এই ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। বিক্রীত জমির ভোগ-দখলের অধিকার সবই এই ব্যক্তির। অনধিকারী সম্পদ আমি কীভাবে গ্রহণ করি? অথচ এই ব্যক্তি, সেই এক ঘড়া

মোহর আমাকে দেবার জন্য জোরাজুরি করছে। দু'দিন পর এ হয়তো আবার এসে বলবে, ঐ জমিতে একটা আমগাছ ছিল, তাতে আম ধরেছে। সব আম আমাকে গ্রহণ করতে হবে। কী ফ্যাসাদে পড়েছি বলুন তো হুজুর!'

অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ শুনে আলেকজান্ডার বিস্মিত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, এ আবার কেমন মামলা! এ ধরনের মামলার কথা জীবনে শুনিনি। দেখি, উপজাতি সর্দার কীভাবে এই মামলার নিষ্পত্তি করেন। আলেকজান্ডার কৌতূহল চেপে রেখে অপেক্ষা করতে থাকেন।

উপজাতি-প্রধান কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর প্রথম অভিযোগকারীকে প্রশ্ন করেন, 'তোমার ছেলেপুলে কি?'

'আজ্ঞে, একটি মাত্র ছেলে।'

'বয়স কত?'

'আজ্ঞে, বাইশ বছর।'

সর্দার এবার দ্বিতীয় অভিযোগকারীকে প্রশ্ন করেন, 'তোমার ছেলেপুলে কি?'

'একটি মাত্র মেয়ে, হুজুর।'

'বয়স কত?'

'উনিশ হবে।'

'তাহলে তো মিটেই গেল।'

আলেকজান্ডার উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলেন উপজাতি-প্রধানের দিকে। প্রধান একটু হেসে বললেন, 'এক কাজ করো। দু'জনের ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দাও, আর ঐ সোনার মোহরগুলো উপহার হিসাবে ওদের দিয়ে দাও।'

অভিযোগকারীদের মুখ দেখে বোঝা গেল, এই সিদ্ধান্তে তারা খুশি হয়েছে। তবু সর্দার তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি, এই সিদ্ধান্তে তোমরা দু'জন রাজী তো?'

উভয়েই জানাল, তারা রাজী এবং খুশি। সর্দারকে অভিবাদন জানিয়ে তারা ফিরে গেল ঘরে। এবার সম্রাট আলেকজান্ডারের দিকে তাকিয়ে প্রধান জিজ্ঞাসা করেন, 'বলুন মহান দিগ্বিজয়ী, আমার সিদ্ধান্ত আপনার কিরূপ লাগল?'

'অপূর্ব। এত সহজ আর সন্তোষজনক বিচার আমি ইতিপূর্বে দেখিনি।'

'আপনার রাজ্যে এ ধরনের মামলার কিভাবে নিষ্পত্তি হতো, সম্রাট?'

'এ ধরনের অভিযোগ আমার রাজ্যে প্রকাশ্যে কখনই আসতো না। সেখানে কেউ

একী! সোনার খাবার কেন?

মাটির নিচে কোনো সম্পদ পেলে তা গোপন করতো, কাউকে জানাতোই না।'

'মনে করুন, যদি জানতে পারা যেত, তাহলে আপনার সরকার কী করতো?'

'সব সম্পদ সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিত এবং যে ব্যক্তি গোপন করেছিল, তাকে শাস্তি দিত।'

'কী আশ্চর্য! যে সম্পদ সরকারের নয়, তা সরকার নিয়ে নেবে? আর যে ভাগ্যবান ব্যক্তি তা উদ্ধার করেছে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে?'

'ন্যায়বিচার এমনই হওয়া উচিত।'

'আপনি একে ন্যায়বিচার বলছেন?'

'অবশ্যই। সভ্য দেশের রীতি অনুযায়ী; আইন অনুযায়ী, অনধিকার সম্পদ ব্যক্তির পরিবর্তে সরকারে বর্তায়।'

উপজাতি-প্রধান একটু ইতস্তত করে আলেকজান্ডারকে বলেন, 'আপনাকে দুটো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'করুন।'

'সূর্য কি আপনার রাজ্যে কিরণ দেয়?'

'অবশ্যই। এ আবার একটা প্রশ্ন হলো নাকি? সূর্য পৃথিবীর সর্বত্র কিরণ দেয়। আপনার এখানে যেমন দেয়, তেমনি আমার রাজ্যেও দেয়।'

'বুঝলাম। এবার বলুন আপনার রাজ্যে বৃষ্টি হয়?'

'কেন হবে না? আমার রাজ্যে সূর্য-কিরণের মতো, প্রচুর বৃষ্টিও হয়।'

'আশ্চর্য! আপনার রাজ্যে নিশ্চয়ই কিছু শান্ত, নিরীহ, অসহায় প্রাণী আছে, তাই না?'

'অবশ্যই আছে। কিন্তু আপনি কেন এ ধরনের অদ্ভুত প্রশ্ন করছেন, তা বুঝতে পারছি না।'

'প্রশ্নগুলো মোটেই অদ্ভুত নয়, সম্রাট। আমি শুধু ভাবছিলাম—যে রাজ্যে ন্যায়বিচার নেই, সেখানে সূর্য কেন কিরণ দিচ্ছে, কেনই বা সেখানে বৃষ্টিপাত হচ্ছে?......এখন বুঝতে পারছি, ঐ নিরীহ শান্ত প্রাণীদের জন্যই তা হচ্ছে।'

আলেকজান্ডার বুঝতে পারলেন উপজাতি-প্রধানের বক্তব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী। স্বার্থপর, লোভী প্রাণীরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে উপযুক্ত না হয়েও, শুধুমাত্র শান্ত, নিরীহ প্রাণীদের জন্যই সূর্য কিরণ দিচ্ছে, বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বড় মূল্যবান তাঁর বক্তব্য। উপজাতি-প্রধানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আলেকজান্ডার বললেন, 'আপনি জ্ঞানী, আজ আপনার কাছ থেকে এক মহৎ শিক্ষা লাভ করলাম।'

(একটি বিদেশী গল্পের অনুসরণে রচিত।)

ছবি : সরোজ সরকার

সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হালদারমশাই। তাঁর মক্কেল প্রাক্তন জাহাজের ক্যাপ্টেনকে যে ফলো করছে তাকে ধরতে হবে। তিনি চলে যেতে কর্নেল বই খুঁজে বের করলেন ব্রোঞ্জ তক্তিটার ছবি। তারপর ফোন করলেন ডঃ মুখার্জিকে পার্চমেন্টের ব্যাপারে। পরদিন তিনি গেলেন দীপনারায়ণবাবুর ফ্ল্যাটে। জাহাজিবাবুর দেখা পাওয়ার বদলে পাওয়া গেল একটা হুমকি!

তিতলিপুরের জঙ্গলে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

৬

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কর্নেল দোমোহানি সেচবাংলোয় পাওয়া হুমকির চিঠিটার সঙ্গে আজকের চিরকুটের লেখা আতস কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করেছিলেন। দুটো লেখাই একজনের। কর্নেল চিঠি আর চিরকুটটা টেবিলের ড্রয়ারে রেখে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুট টানছিলেন। চোখ যথারীতি বন্ধ।

বলেছিলাম—জাহাজিবাবু লিখেছিল আপনাকে চেনে। তাহলে এই রিস্ক নিল কেন সে? ওকে তো আবার ওই ফ্ল্যাটে ফিরতে হবে। লোকটা যদি সত্যিই আপনার প্রকৃত পরিচয় জেনে থাকে, তাহলে তার এ-ও জানার কথা, আপনি তার পিছনে পুলিশ লাগিয়ে দেবেন।

কর্নেল বলেছিলেন—পুলিশ নিজে থেকেই ওখানে হানা দেবে। কারণ চন্দ্রপুর থানার ও সি রাজেনবাবু নিশ্চয় লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে খবর পাঠিয়েছেন। তুমি সাংবাদিক। তোমার জানার কথা, পুলিশ সহজে কোনো বাড়তি কাজে হাত লাগায় না। পুলিশেরও আজকাল অনেক অসুবিধে আছে। কোথায় হাত দিতে গিয়ে কোন রাজনৈতিক গার্জেনের ছোবল খাবে।

—কেন? আপনি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার আপনার বিশেষ স্নেহভাজন মিঃ অরিজিৎ লাহিড়িকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিন।

—এখনও সে-সময় আসেনি। আমি চাই না পুলিশ এখনই জল ঘোলা করুক। তাতে মূল রহস্য আর কোনওদিনই জানা যাবে না। আমাকে নিজের পদ্ধতিতে এগোতে হবে। হালদারমশাই আসুন। তারপর পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী রকম, তা হয়তো বোঝা যাবে।...

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদারের আবির্ভাব ঘটল সাড়ে নটায়। সবেগে ঢুকে ধপাস করে বসে বললেন—হেভি মিস্ট্রি। তাই এট্টু দেরি হইয়া গেল।

কর্নেল বললেন—বলুন হালদারমশাই!

হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিয়ে যা বললেন, তা এই ঃ

'অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন এস এন সিংহ সাউদার্ন অ্যাভেনিউতে বাড়ির দোতলায় একা থাকেন। তাঁর একমাত্র ছেলে থাকে আমেরিকার বস্টনে। সে সেখানে বিয়ে করেছে। বছরে একবার এসে বাবাকে দেখে যায়। ক্যাপ্টেন সিংহের রান্না আর কাজকর্ম করে দিয়ে যায় একজন ঠিকে ঝি। এই মেয়েটি থাকে লেকের ধারে একটা বস্তিতে। রাস্তার দিকের ঘরটা ক্যাপ্টেন সিংহের ড্রয়িং রুম। দেশবিদেশের নানারকম শিল্পদ্রব্যে সাজানো। ভিতরের দরজা দিয়ে গেলে শোবার ঘর। সেখানে আলমারিঠাসা বই আর দেওয়ালে টাঙানো আছে তাঁর পারিবারিক ছবি। তৃতীয় ঘরটা কিচেন আর ডাইনিং। কিচেনের অংশটা পার্টিশন করা আছে।

কথায়-কথায় ক্যাপ্টেন সিংহ বলেছেন, সারাজীবন ঘরছাড়া হয়ে কাটিয়েছেন। তাই তাঁর বন্ধুবান্ধব নেই। আত্মীয়-স্বজন কলকাতার নানা জায়গায় থাকেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কম। অবসরজীবনে তিনি স্থানীয় একটা ক্লাবের সদস্য হয়েছিলেন। ক্লাবটা উঠে গেছে। তবে পাড়ায় কয়েকজন তাঁর বয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে বন্ধুতা আছে। প্রতিদিন ভোরে তাঁদের সঙ্গে লেকের ধারে হাঁটাহাঁটি করে আসেন। ঠিকে ঝি আসে বেলা আটটা-সাড়ে আটটায়।

হালদারমশাই জানতে চেয়েছিলেন, গতিবিধি জানার জন্য তাঁর পিছনে লোক লাগানোর কোনও কারণ আছে বলে কি তিনি মনে করেন? ক্যাপ্টেন সিংহ বলেন, তেমন কোনও কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে বছর দশেক আগে তাঁর এক সহকর্মী তাঁকে একটা প্যাকেট রাখতে দিয়েছিলেন। তখন তিনি জাহাজে ছিলেন। জাহাজটা আসছিল মিশরের পোর্ট সইদ বন্দর থেকে বোম্বে। তারপর কলকাতা। তাঁর সেই সহকর্মীর নাম ছিল অজয়েন্দু রায়। বোম্বে আসার পথে আরব সাগরে জাহাজটার তলায় ফাটল ধরে ডুবতে থাকে। বিপদসংকেত পাঠান তিনি। বোম্বে বন্দর থেকে উদ্ধারকারী জাহাজ পৌঁছায়। কিন্তু তখন জাহাজটার পিছন দিক ডুবে যায়। অনেক নাবিক প্রাণ হারায় জলের তলায়। মোড়কটা ক্যাপ্টেন সিংহের ব্যাগে ছিল। ব্যাগটা তিনি সবসময় কাছে রাখতেন। তিনি উদ্ধার পান। কিন্তু অজয়েন্দু রায়ের আর খোঁজ পাননি। জাহাজে মিশরের তুলো বোঝাই ছিল। সব নষ্ট হয়ে যায়। বোম্বেতে কিছুদিন থাকার পর ক্যাপ্টেন সিংহ তাঁর কম্পানির আর একটা ছোট মালবাহী জাহাজ নিয়ে কলকাতা বন্দরে আসেন। তারপর প্যাকেটটা বাড়িতে রেখে খিদিরপুর ডকে নিজের কাজে ফিরে যান।

অজয়েন্দু রায়ের অধীনে একজন অফিসার ছিলেন। তাঁর নাম শম্ভুনাথ চৌধুরি। তিনি ক্যাপ্টেন সিংহের কাছে অজয়েন্দুবাবুর গচ্ছিত প্যাকেটের কথা কীভাবে জানতে পেরেছিলেন, এটাই আশ্চর্য! প্রায়ই এই লোকটা তাঁর কাছে প্যাকেটটা দাবি করত। অন্যের জিনিস তিনি কেন দেবেন শম্ভুবাবুকে? তিনি ওঁকে ধমক দিয়ে বলতেন, তেমন কোনও প্যাকেট অজয়েন্দুবাবু তাঁকে দেননি। তারপর তো চাকরি থেকে ক্যাপ্টেন সিংহ অবসর নেন। দু'বছর আগে একদিন তিনি ব্যাংকে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে তাঁর ঠিকে-ঝি সুশীলার কাছে শোনেন, এক ভদ্রলোক তাঁর খোঁজে এসেছিলেন। তাঁকে সুশীলা ড্রয়িং রুমে বসিয়ে রেখেছিল। তারপর কখন ভদ্রলোক চলে গেছেন, সুশীলা দেখতে পায়নি। ক্যাপ্টেন সিংহ সুশীলাকে বকাবকি করেন। তবে সুশীলার দোষ ছিল না। তাকে তিনি বিশ্বাস করেন। তাই বাড়ির চাবি তাকে দিয়ে যেতেন। কারণ সুশীলা সব ঘর পরিষ্কার করত। মেঝে মুছত। যাই হোক, দিনে তাঁর কথাটা মাথায় আসেনি। রাত্রে তিনি সন্দেহবশে বেডরুমে তাঁর খাটে বিছানায় তলা খোঁজেন। প্যাকেটটা ম্যাট্রেসের তলায় রাখা ছিল। সেটা উধাও হয়ে গেছে।

সুশীলার কাছে আগন্তুক ভদ্রলোকের চেহারার যে বিবরণ তিনি পান, তাতে তিনি চিনতে পারেননি ভদ্রলোককে। তাঁর মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ছিল। পরনে টাই-স্যুট ছিল। তিনি পাইপ খাচ্ছিলেন।

এমন সাহেব-মানুষকে সুশীলা ড্রয়িং রুমে বসতে দেবে, এটা স্বাভাবিক। ব্যাংকটা কাছেই। কাজেই ক্যাপ্টেন সিংহের শিগগির বাড়ি ফেরার কথা। তবে তারপর থেকে সুশীলার হাতে চাবি দিয়ে তিনি বেরোন না। সুশীলা ঘর পরিষ্কার এবং রান্না করে চলে যাওয়ার পর তিনি দরকার হলে বাইরে যান।...'

হালদারমশাইয়ের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু কর্নেলের কথা বলার আগে আমার কোনও কথা বলা উচিত হবে না। চন্দ্রপুরের জাহাজিবাবুর সঙ্গে হালদারমশাইয়ের মক্কেলের একটা যোগসূত্র তাহলে পাওয়া গেল। ক্যাপ্টেন সিংহকে অজয়েন্দু রায় যা রাখতে দিয়েছিলেন, তা জাহাজিবাবুই যে ছদ্মবেশে চুরি করে নিয়ে যায়, তা-ও স্পষ্ট হলো। জিনিসটা যে পিতলের নলে রাখা পার্চমেন্ট, তা-ও বোঝা গেল। শুধু বুঝতে পারলাম না, এতদিন পরে কে ক্যাপ্টেন সিংহের গতিবিধির উপর নজর রেখেছে? তার উদ্দেশ্যই বা কী?

হালদারমশাই ব্রেকফাস্ট করে এসেছেন। কর্নেল ও আমি ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। তারপর কফি আনল ষষ্ঠীচরণ। হালদারমশাই ফুঁ দিয়ে কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললেন—দুইখান পয়েন্ট আমার মাথায় আইয়া পড়ছে। কমু?

কর্নেল বললেন—বলুন।

—সুশীলা রোজ ঘর পরিষ্কার করত। সে নিশ্চয় প্যাকেটখান বিছানার তলায় দেখছিল। তার লগে শম্ভুনাথ চৌধুরি ছদ্মবেশে গোপনে যোগাযোগ করছিল। সুশীলা ক্যাপ্টেন সিংহেরে মিথ্যা কইছে। গোপনে সে-ই টাকার লোভে প্যাকেটখান শম্ভুনাথেরে দিছে। ক্যাপ্টেন সিংহ সুশীলারে বিশ্বাস কইরা ঠকছেন। এই হইল গিয়া প্রথম পয়েন্ট।

—দ্বিতীয় পয়েন্ট?

গোয়েন্দাপ্রবর চাপা স্বরে বললেন—ক্যাপ্টেন সিংহ আমার মক্কেল। কিন্তু তিনি আমারে কিছু কথা নিশ্চয় গোপন করছেন। আমার মনে হয় কী জানেন কর্নেলস্যার? কমু?

—নিশ্চয়। কী মনে হয়, তা খুলে বলুন।

—অজয়েন্দু রায় ক্যাপ্টেন সিংহেরে প্যাকেটখান রাখতে দেন নাই। সিংহসায়েবই অজয়েন্দুবাবুর থেক্যা ওটা চুরি করছিলেন। জাহাজডুবির সময় অজয়েন্দুবাবুরে উনিই সম্ভবত আরব সমুদ্দুরে ধাক্কা মাইর‍্যা ফেলছিলেন।

কর্নেল হাসলেন।—তারপর অজয়েন্দু রায় কোনও ভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং ক্যাপ্টেন সিংহ তাঁকে জিনিসটা ফেরত দেননি বা দিতে পারেননি। কারণ প্যাকেটটা চুরি গিয়েছিল—

কর্নেলের কথার উপর আমি বললাম—সময়ের কথা ভুলে যাচ্ছেন। জাহাজডুবি হয়েছিল দশবছর আগে। আর ক্যাপ্টেন সিংহের ঘর থেকে প্যাকেটটা শম্ভুনাথ হাতায় দু'বছর আগে। বেঁচে থাকলে অজয়েন্দুবাবু প্যাকেটটা এতবছর ধরে দাবি করতে আসেননি কেন?

হালদারমশাই বললেন—ক্যাপ্টেন সিংহ আমারে কিছু কথা গোপন করছেন।

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। আপনার অনুমান যুক্তিসঙ্গত। তবে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো, এতদিন পরে ক্যাপ্টেন সিংহের গতিবিধির উপর যে নজর রেখেছে, সে কি অজয়েন্দুবাবুর চর? অজয়েন্দুবাবু কি বেঁচে গিয়েছিলেন এবং কোনও কারণে দশবছর চুপচাপ ছিলেন? কী সেই কারণ?

আমি বললাম—কিন্তু তিনি চর লাগিয়েছেন কেন? সরাসরি নিজে ক্যাপ্টেন সিংহের সামনে যাচ্ছেন না কেন?

হালদারমশাই বললেন—কর্নেলস্যার! এইজন্যই কইছিলাম হেভি মিস্ট্রি! আমার মক্কেল আমারে কথা গোপন করলে আমি তারে ক্যানসেল কইর‍্যা দিমু।

কর্নেল বললেন—না হালদারমশাই! আপনার কেসে আমারও ইনটারেস্ট আছে। কেন আছে তা পরে বলব। আপাতত ক্যাপ্টেন সিংহের কাছে আপনার জানা দরকার, কে তাঁকে ফলো করে। আপনি ওঁকে রাস্তায় হেঁটে যেতে বলবেন। তখন নিশ্চয় লোকটা তাঁকে ফলো করবে। আপনি ওঁকে যে কৌশলে হোক, লোকটাকে দেখিয়ে দিতে বলবেন। সাবধান! উনি যেন পিছু ফিরে ইশারায় না দেখান। শুধু মুখের কথায় লোকটার বর্ণনা দেন। হালদারমশাই! চিয়ার আপ! আপনি চৌত্রিশ বছর পুলিশে চাকরি করেছেন। অবসরের সময় আপনি ছিলেন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর। আপনাকে বেশি কথা বলতে চাই না। তবে প্লিজ, হঠকারিতা করবেন না!

উত্তেজনায় গোয়েন্দাপ্রবরের গোঁফের ডগা তিরতির করে কাঁপছিল। তিনি বললেন—না, না কর্নেলস্যার। লোকটা ক্যাপ্টেন সিংহেরে ফলো করে। এবার আমি অরে ফলো করুম।

বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর 'যাই গিয়া' বলে সবেগে প্রস্থান করলেন।

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে টাকে হাত বুলোতে থাকলেন। একটু পরে টেলিফোন বাজল। অমনই কর্নেল চোখ খুলে সিধে হয়ে হাত বাড়ালেন টেলিফোনের দিকে। তারপর রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন।—বলছি।.....মিঃ হাটি! মর্নিং! বলুন!.....হ্যাঁ। কাজি গোলাম হোসেন থাকেন। আমি সকালেই গিয়েছিলাম ওখানে।..... কাজিসাহেবকে না পাওয়ারই কথা।.....কেন একথা বলছি? মিঃ হাটি, লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকে বলুন, সাদা পোশাকে কাজিসাহেবের ডেরার কাছে যেন সারাক্ষণ অন্তত দু'জন সশস্ত্র লোক মোতায়েন থাকে।....হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। ওই কাজিসাহেবই পাঁজি জাহাজিবাবু।...হ্যাঁ। সিওর। আর একটা কথা। আপনি লালবাজারকে বলুন, কড়েয়া থানা থেকেও যেন কাজিসায়েবের দিকে নজর রাখা হয়।....হ্যাঁ। ওটা কড়েয়া থানা এলাকায় পড়ে।....ঠিক আছে। উইশ ইউ গুড লাক।...

রিসিভার রেখে কর্নেল আবার ধ্যানস্থ হলেন। বললাম—তাহলে আমরা চলে আসবার পরই লালবাজার থেকে অফিসার গিয়েছিলেন?

—হুঁ।

—জাহাজিবাবু মহা ধূর্ত। ও এখন কিছুদিন গাঢাকা দেবে। পাড়ায় নিশ্চয় ওর পোষ্য গুণ্ডা-মস্তান আছে!

—হুঁ।

—অজয়েন্দুবাবুর ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ উনি যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে এতদিন কোথায় ছিলেন? উনি বেঁচে না থাকলে অন্য কেউ কি পার্চমেন্টটার কথা জানত? সে-ই কি ক্যাপ্টেন সিংহের উপর নজর রেখেছে, যাতে উনি জিনিসটা কাকেও বেচলে সে জানতে পারবে?

—হুঁ!

এবার আমার জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে এল। কর্নেলের এই 'হুঁ' মানে উনি আমার কথা শুনছেন না। এই হুঁ-র সঙ্গে আমি দীর্ঘকাল পরিচিত। তাই চুপ করে গেলাম। খবরের কাগজ টেনে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল হঠাৎ চোখ খুলে সিধে হয়ে টেবিলের ড্রয়ার টানলেন। একটা নোটবই বের করে পাতা ওল্টাতে থাকলেন। তারপর টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। সাড়া এলে ইংরেজিতে বললেন—ইন্ডিয়ান শিপিং কর্পোরেশন?....আমি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ অসীম সোমের সঙ্গে কথা বলতে চাই।....আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। ইয়া। কলোনেল!

প্রায় তিন মিনিট পরে সাড়া এল, তা বুঝলাম। কর্নেল বললেন—মিঃ সোম!...হ্যাঁ, সেই সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধই বটে। আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী।....ধন্যবাদ। তবে বিষয়টা একটু জটিল। আন্দাজে ঢিল ছোড়ার মতো। আপনি নোট করে নিলে ভালো হয়।....দশবছর আগেকার ঘটনা। জাহাজের নাম জানি না। তবে দেশি জাহাজ। কাজেই আপনাদের কাছে পুরনো রেকর্ডে খোঁজ মিলতে পারে। পোর্ট সইদ থেকে জাহাজটা আসছিল বোম্বে। মিশরের উৎকৃষ্ট তুলো বোঝাই ছিল।....হ্যাঁ। জাহাজটার তলায় কী ভাবে ফাটল ধরে আরব সাগরে ডুবে গিয়েছিল। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের নাম ছিল এস এন সিংহ। সৌমেন্দ্রনাথ সিংহ। এটাই জাহাজটা শনাক্ত করার একটা পয়েন্ট।....ও কে। সেই জাহাজে একজন অফিসার ছিলেন অজয়েন্দু রায়। তিনি নাকি বোম্বে থেকে উদ্ধারকারী জাহাজ সেখানে পৌঁছুনোর আগেই সমুদ্রে তলিয়ে যান।....না। লাইফ জ্যাকেট পরার সুযোগ পেয়েছিলেন কিনা জানি না। মোট কথা তিনি নাকি নিখোঁজ হয়ে যান।....ক্যাপ্টেন সিংহ এখন অবসরপ্রাপ্ত। আমার বয়সী বৃদ্ধ। তাঁকে আমি চিনি। তাঁর কাছেই এই ঘটনা শুনেছি।....হ্যাঁ। তিনিই বলেছেন, অজয়েন্দু রায় আরব সাগরে ডুবে মারা পড়েন। কিন্তু আমার জানার বিষয় শুধু একটা। মাত্র একটা।....হ্যাঁ অজয়েন্দু রায় সম্পর্কে আপনাদের পুরনো রেকর্ডে কোনও তথ্য আছে কিনা। থাকলে কী সেই তথ্য?....তা সময় লাগুক। প্লিজ মিঃ সোম! এটা খুব জরুরি।...হ্যাঁ। একটা কেস আমার হাতে এসেছে বৈকি। যথাসময়ে আপনাকে জানাব।....ধন্যবাদ মিঃ সোম। অসংখ্য ধন্যবাদ।...

রিসিভার রেখে কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট লাইটার জ্বেলে ধরালেন। বললাম—বাঃ! এই একটা কাজের কাজ করলেন। কিন্তু জাহাজিবাবু শম্ভুনাথ চৌধুরির নামটা ওঁকে দিলেন না কেন?

কর্নেল ধোঁয়ার মধ্যে বললেন—জয়ন্ত! কান টানলে মাথাও আসে।...

লাঞ্চের পর সবে অভ্যাসমতো ডিভানে একটু ভাতঘুম দিতে শুয়েছি, হয়তো ঘুমিয়েও পড়েছিলাম, কর্নেলের ডাকে উঠে বসতে হলো। উনি সহাস্যে বললেন—মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এস। সাড়ে তিনটে বাজে। বিকেল চারটেতে ডঃ রথীশ মুখার্জির সঙ্গে

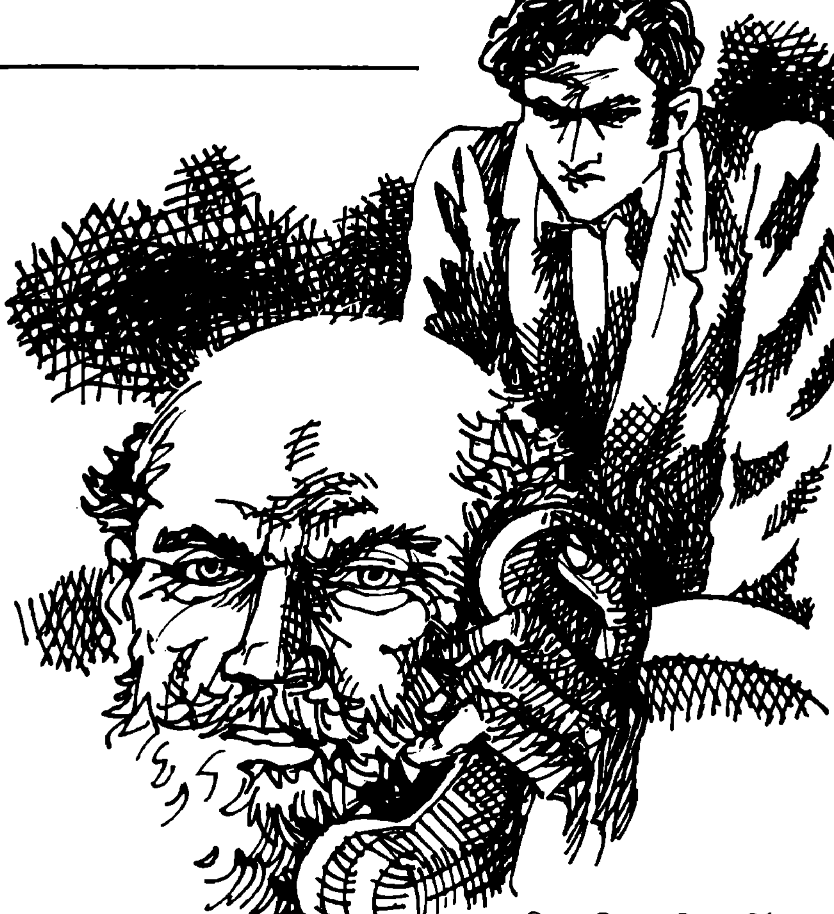

বলছি।.....মিঃ হাটি! মর্নিং!

দেখা করার কথা। উনি থাকেন ওল্ড বালিগঞ্জ প্লেসে। শিগগির রেডি হয়ে নাও।...

ওল্ড বালিগঞ্জ প্লেসে একটা পাঁচিলঘেরা বাড়ির গেটের সামনে কর্নেল নামলেন। দেখলাম, তাঁকে সেলাম ঠুকে দারোয়ান গেট খুলে দিল। লন দিয়ে এগিয়ে কর্নেলের নির্দেশে একপাশে গাড়ি দাঁড় করালাম। দোতলার বারান্দা থেকে এক সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ, মাথায় কর্নেলের মতো টাক, দাড়ি নেই, কিন্তু একটুখানি গোঁফ আছে, পরনে পাঞ্জাবির উপর শাল জড়ানো, সহাস্যে বললেন—আসুন! আসুন কর্নেলসায়েব!

নিচে একটি মধ্যবয়সী লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে নমস্কার করে কর্নেল ও আমাকে নিচের ঘরে নিয়ে গেল। বসার ঘর। কিন্তু চারদিকে শিলিং অবধি র‍্যাকে বই ঠাসা। বসার ঘর থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কর্নেলের হাত ধরে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক টানতে টানতে একটা ঘরে ঢোকালেন। এ ঘরটাও বইয়ে ঠাসা। এক প্রান্তে বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল। পিছনে জানালা। বিকেলের এক চিলতে রোদ এসে টেবিলে পড়েছে। বই ছাড়া ঘরে এখানে-ওখানে টুলের উপর নানারকম মূর্তি চোখে পড়ল।

কর্নেল আমার সঙ্গে ডঃ মুখার্জির আলাপ করিয়ে দিলেন। ডঃ মুখার্জি সেই লোকটাকে শিগগির কফি আনতে বললেন। আমরা তাঁর মুখোমুখি বসলাম।

ডঃ মুখার্জি মুচকি হেসে বললেন—আপনাকে দেখলেই রহস্যের গন্ধ পাই। এখনও পাচ্ছি!

কর্নেল হাসলেন।—এবারও লিপিরহস্য।

—কী লিপি?

—পার্চমেন্টে লেখা কিউনিফর্ম লিপি।

ডঃ মুখার্জি সকৌতুকে চাপা স্বরে বললেন—গুপ্তধন? আমি বলি গুপ্তধন ইজ লুপ্তধন! দেখি আপনার পার্চমেন্ট।

কর্নেল বললেন—সমস্যা হলো, মূল পার্চমেন্টটা হাতে পাইনি। ফোটোকপি এনেছি। বলে তিনি জ্যাকেটের ভিতর পকেট থেকে পার্চমেন্ট স্ক্রোলের মতো গুটিয়ে রাখা একটা একই সাইজের ফোটো বের করে ওঁর হাতে দিলেন।

ডঃ মুখার্জি ব্যগ্রভাবে ফোটোকপিটা সোজা করে টেবিলল্যাম্পের আলোয় চারটে কাচের পেপারওয়েটে চারকোণে চাপা দিলেন। তারপর প্রকাণ্ড আতস কাচ দিয়ে কিছুক্ষণ লিপিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে ডঃ মুখার্জিকে লক্ষ্য করছিলেন। একটু পরে বললেন—পাঠোদ্ধার সম্ভব কি?

ডঃ মুখার্জি বললেন—উপরে বামকোণে এই রেখাগুলো কারুকার্য নয়। আরবি লিপিতে লেখা আছে: 'আল-কাহিরো খাজিনাত্ আত্-তুহাত্।' তার মানে, কায়রো মিউজিয়াম। আল-কাহিরোকে আমরা বলি কায়রো।

—তাহলে এটা কায়রো জাদুঘরের পার্চমেন্ট? কিন্তু লিপি তো কিউনিফর্ম! মিশরে এ লিপি তো প্রচলিত ছিল না বলেই জানি। আপনি অবশ্য আমার চেয়ে আরও বেশি জানেন।

এই সময় সেই লোকটা ট্রেতে কফি আর বিস্কুট নিয়ে এল। টেবিলে ট্রে একপাশে রেখে সে চলে গেল। ডঃ মুখার্জি বললেন—আপনারা কফি খান। আমি একটু আগে খেয়েছি। এক মিনিট! বলে তিনি পাশের র‍্যাক থেকে একটা প্রকাণ্ড বই দু'হাতে টেনে আনলেন। তারপর সেটার সূচিপত্র দেখে একটা পাতা বের করলেন। কয়েকটা পাতা উল্টে তিনি হাসলেন।—পেয়েছি। এটা হিটাইট লিপি। বর্তমান তুরস্কের 'বোগাজ কই' নামে একটা পাহাড়ি জনপদে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে উনিশ শতকে পাপিরাসে লেখা একটা চিঠি উদ্ধার করা হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে হিটাইট অর্থাৎ হাত্তির রাজা সুপ্পিলুলিউমাসকে মিশরের কিশোর রাজা তুত-আংক্-আমন অর্থাৎ তুতানখামেনের অকালমৃত্যুর পর তাঁর বিধবা বালিকাবধূ নেকারতিতি এই চিঠিতে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি পুনর্বিবাহ করতে চান। কিন্তু মিশরে তাঁর অনেক শত্রু আছে। তাই তিনি হাত্তিদেশের একজন বর চান। কিন্তু কর্নেলসায়েব! পাপিরাসে লেখা সেই চিঠির এটা একটা নকল কপি। মূল পাপিরাসে লেখা চিঠিটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রত্নবিদ উইলিয়াম রাইট পার্চমেন্টে এই কপি করেন।...

[চলবে]

ছবি : বিজন কর্মকার

চিলেকোঠার ভূত

শিপ্রা মুখোপাধ্যায়

বিশাখাপত্তনম পৌঁছতে প্রায় ভোর ছটা বেজে গেল। মোটঘাট নিয়ে গৌরকিশোর চললেন সমুদ্রের ধারের ভাড়া বাড়িতে। সঙ্গে স্ত্রী মালতী, মেয়ে সবিতা আর দু' ছেলে, পাটাই আর নিতাই।

ভজহরিও সঙ্গে আছে। বহুদিনের কাজের লোক ভজহরি। কাজের লোক হলেও গৌরকিশোরের ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী।

এখানে বাড়ির ব্যবস্থা করেছেন পাড়াতুতো দাদা নন্দলাল বসু। থাকেন বিশাখাপত্তনমে। নন্দদাকে লিখেছিলেন গৌরকিশোর—

'নন্দদা, তোমার বৌমার শরীর খারাপ। বায়ু পরিবর্তন দরকার। ওখানে একটা ঘরের ব্যবস্থা করো।'

সেই কথায় কাজ হয়েছে। ঘর যোগাড় হয়েছে। নন্দলাল স্টেশনে এসেছেন ওদের নিয়ে যেতে। ভদ্রলোক অবিবাহিত। তাই গৌরের থেকে বছর আটেকের বড় হয়েও ছেলে-মেয়েদের কাকুই রয়ে গেছেন।

বাড়িতে পৌঁছে খুশি সকলে। ফরাসী আমলের দোতলা বাড়ি। লালচে রঙের আর্চ করা দোতলার বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। ছুটোপুটি শুরু হয়ে গেছে ছেলে-মেয়েদের। সকলের 'মনপসন্দ' হয়েছে বাড়িটা, ভজু বাদে। সে শুধু খুঁতখুঁত করে, এত বড় বাড়ি এখানে কি দরকার? পরিষ্কার করা কি চাট্টিখানি কথা? ওর কথায় গৌরকিশোর বলেছেন, কলকাতায় তো এতবড় বাড়িতে থাকতে পাস না, থাক না এখানে। তারপর মেয়ের দিকে ফিরে বলেন, সবিতা, তোমার দায়িত্ব ভাইদের দেখাশোনা করা। ওদের কখনও ছাতে যেতে দেবে না, সমুদ্রের ধারেও না।

কুবুদ্ধির রাজা পাটাই, সবিতা তা ভালভাবে জানে। তাই সে বলে, যদি পাটাই কথা না শোনে?

তখন আমায় বলবে। এই পাটাই-নিতাই, দিদির কথা তোমরা নিশ্চয় শুনবে।

ঘুলঘুলির ভূত

বেশ কয়দিন পর সবিতা দুপুরে একখানা গল্পের বই নিয়ে শুয়েছে। নিঝুম দুপুর। বেশ গা-ছমছমে বইখানা। পড়তে পড়তে একদম ডুবে গেছে সবিতা, এমন সময়ে কানে এল পাটাইয়ের গলা, এই দিদি, ছাতে যাবি?

পাটাই। ঘুমোসনি এখনও?

চল না দিদি, ছাতটা দেখে আসি।

বাবা বকবে।

জানতেই পারবে না।

ভাইয়ের অনুরোধ আর ছাত থেকে সমুদ্র দেখার লোভে রাজী হয়ে যায় সবিতা। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দু'জনে ধাক্কা খায়। ক্ষোভের গলায় সবিতা বলে, এ কী পাটাই,

দরজা তো পেরেক পুঁতে বন্ধ করা।

পাটাই উত্তর দেয়, কোনো চিন্তা নেই, এই দেখ, আমি খুলে দিচ্ছি।

তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? এতদিন ধরে বন্ধ দরজাটা তুই খুলতে পারবি?

হোক না। 'না পেরু পাটাই'। অর্থাৎ আমার নাম পাটাই।

পাটাইয়ের গলার স্বরে চমকে উঠেছে সবিতা।

এই ভাষা কোথায় শিখলি রে? এটা তো তেলেগু ভাষা।

বলবো কেন?

কথা বলতে বলতে একটানে দরজাটা খুলে ফেলেছে পাটাই। সবিতা আশ্চর্য হয় পাটাইয়ের দরজা খোলায়। বলে, তুই যে ভেলকি দেখাচ্ছিস রে। দরজাটা কি খোলা ছিল?

কোনো উত্তর না দিয়ে পাটাই ছাতের এক কোণ থেকে অন্য কোণে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল, যেন হাওয়ায় ভাসছে।

ছাতের চিলেকোঠায় অনেকগুলো চোরা কুঠরি। সেই চোরা কুঠরিতে অসংখ্য ঘুলঘুলি রয়েছে। পায়রাগুলো ডানা ঝটপটিয়ে উড়ছে। আবার ঢুকে যাচ্ছে ঘুলঘুলিতে।

একটা কুঠরিতে ঢুকে আবার আর একটা কুঠরিতে ঢোকা যায়। সবিতার গা ছমছম করে ওঠে। ভাবে নেমে যাবে, কিন্তু বের হতে পারে না। একি গোলকধাঁধা রে বাবা।

বাবার কাছে শুনেছিল লক্ষ্ণৌয়ের ভুলভুলাইয়ার কথা। এ তো তেমনি মনে হচ্ছে। ভয়ে চিৎকার করে ওঠে, পাটাই, তুই কোথায়? সে কথা পাটাইয়ের কানে গেল কিনা কে জানে।

এই কুঠরি থেকে সেই কুঠরি ঘুরতে ঘুরতে সবিতার ভয়ে দম বন্ধ হবার অবস্থা। হঠাৎই কানে এল চি চি শব্দ।

'আক্কা নেনু ইক্কড়া। ইদি চুডু।' অর্থাৎ দিদি আমি এখানে। এই দেখ।

সবিতার নজর যায় ওপরের ছোট ঘুলঘুলিতে। কেমন ছোট্ট হয়ে বসে আছে পাটাই। সে চেঁচায়, পাটাই, নাম বলছি। বাবাকে বলে দেব।

আবার সেই চি চি শব্দ। ভর দুপুর তখন। মনে হলো রাত হয়ে গেছে। আলো জ্বলে উঠল। গলা শুকিয়ে কাঠ। গোঁ গোঁ করে শব্দ হতে থাকে সবিতার মুখ দিয়ে।

কি হয়েছে? এই সবিতা, স্বপ্ন দেখছিলি?

সবিতা চোখ মেলে দেখে, বাবা-মা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছেন। বিছানায় শুয়ে আছে সে।

কি হয়েছে মা? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে সবিতা।

কি আবার হবে গোঁ গোঁ শব্দ করছিলি। যত নষ্টের গোড়া ঐ ভজুটা। যত সব ভূতের গল্প করে এই হাল করছে। গৌরকিশোর রাগে গজগজ করেন।

সবিতা চোখে-মুখে জল দিয়েই ছোটে পাটাই-নিতাইয়ের ঘরে। ওমা! এই তো পাটাই নিতাইকে জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। তাই যদি হবে তাহলে ঐ ছাতের পাটাই কে? ওটা কি পাটাই না? সত্যিই কি সে স্বপ্ন দেখেছে? সিঁড়িটাই দেখা যাক না। সবিতা এগিয়ে যায় সিঁড়ির দিকে। একি! এ তো সেই স্বপ্নে দেখা দরজার মতোই দরজা। তবে পেরেক মেরে আটকানো। সবিতা ভাবে এ কথা কাউকে বলা যাবে না। তাহলে ছোটরা ভয় পাবে। সে ফিরে আসে সিঁড়ির থেকে। ভয়ে ঘাড় শিরশির করেছে। পায়রার ঝটপটানি শুনেই তরতরিয়ে লাফিয়ে নামে দোতলায়।

স্বপ্ন দেখেনি। এ বাড়িতে ভূত আছে। মায়ের শরীর খারাপ। তাই মুখ বন্ধ করে রাখে সবিতা। কিন্তু একটা ভয় তাকে তাড়া করে সব সময়।

বিড়ালখেকো ভূত

একদিন গৌরকিশোর ছেলেদের জন্য সুন্দর সুন্দর পাথরের পুতুল নিয়ে এলেন। একটা বিকট মূর্তি দেখিয়ে সবিতা বলে, বাবা, এটা কি গো?

ওটা দক্ষিণ ভারতের লোকেরা ঘরে রেখে দেয়। যাতে কারও কুদৃষ্টি না পড়ে সেইজন্য।

মূর্তিটা হাতে তুলে নেয় সবিতা। ভাবে ভালই হয়েছে। এবার থেকে এই বীভৎস মূর্তিটাই তাকে রক্ষা করবে। মূর্তিটার দিকে চেয়ে থাকে সবিতা। মূর্তি নয়, একটা বিকট মুখ। তার চার পাশে সূর্যের মতো ছটা। ঠোঁটের দুই ধার থেকে বেরিয়ে আছে দাঁত। লম্বা নাকের নিচে ইয়া গোঁফ। রক্তাভ চোখ দেখলে ভয় হবে। পুতুলটায় নিমগ্ন হয়ে গেছে সবিতা। বাবার ধমক কানে এল।

কি হলো পাটাই? ঝগড়া করছো কেন?

দেখো না বাবা, দাদা ঐ ঘোড়সওয়ার পুতুলটা দিচ্ছে না। নিতাই বলে।

পাটাই, দিয়ে দাও ভাইকে।

না। ওটা আমি নেব।

ঠিক আছে কাউকে নিতে হবে না। বলেই একটানে গৌরকিশোর পুতুলটা জঙ্গলে ছুঁড়ে দিলেন।

পাটাইয়ের চোখে জল এসে গেল, অত সুন্দর একটা পুতুল হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায়। নিতাইয়েরও কষ্ট হলো পুতুলটা না পেয়ে। কিন্তু দাদা পুতুলটা পায়নি তাতেই কষ্টটা লাঘব হলো।

মুখটা কাছে থাকায় সবিতার ভূতের ভয় কমেছে। তবুও অন্ধকারে ভূতের ভয়ে গা শিউরে ওঠে। খাটের নিচে মনে হয় ভূত লুকিয়ে আছে। পা গুটিয়ে নিয়ে বসে। সেদিন বেশ একটু রাত হয়ে গেল পড়তে পড়তে। ভজহরি দুধ হাতে নিয়ে দাঁড়াল।

গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও। গ্লাসটা রাখতে রাখতে বলল ভজহরি।

ভজুদা, তুমি একটু বসবে? মিনতি করে সবিতা। আমার একা ভয় করছে।

কেন ভয় করছে? আচ্ছা বসছি, তুমি পড়।

বেশ মন লাগিয়ে পড়ছে সবিতা। হঠাৎ কেমন একটা শব্দ হলো। সবিতা দেখে ভজহরির জায়গায় পাটাই বসে আছে।

এই পাটাই, ভজহরিদা কোথায় গেল?

'নেনু ভজহরি, ইদি চুডু। পাটাই বেলপোইন্দি'। অর্থাৎ আমি ভজহরি, এই দেখ। পাটাই চলে গেছে।

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে সবিতার। হ্যাঁ ঠিকই তো। ঐ তো ভজহরি ঝিমোচ্ছে। একি দেখছে সবিতা। তবে কি নিজেই ঘুমোচ্ছে?

ও ভজহরিদা।

সবিতার ডাকে ভজহরি মুখ ফেরাল তার দিকে। আঁৎকে উঠল সবিতা। এ কোন ভজহরি! গালের মাংস ঝুলে পড়েছে। হিহি করে হাসছে। সাপের মতো সরু চেরা জিভ মুখ থেকে একবার বেরুচ্ছে আবার ঢুকছে। হঠাৎ একটা বিড়ালছানা বের হয়ে এল ভজহরির মুখ থেকে। ম্যাঁও ম্যাঁও করে হাঁটতে হাঁটতে সে যেই একটু এগিয়েছে অমনি লকলকে জিভ দিয়ে সুরুৎ করে বিড়ালছানাটাকে টেনে নিল ভজহরি। গজদন্ত বের করে বিড়ালের গলা ফুটো

করে রক্ত চুষতে লাগল। তারপর মাথাটা হাতে ধরে ছানাটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। সবশেষে মাথাটা সবিতাকে দেখিয়ে তেলেগুতে জিজ্ঞেস করে, খাবে?

সকালে জ্ঞান ফিরতে সবিতা দেখে বাবা-মা, পাটাই-নিতাই সবাই তার পাশে। ভজহরির দিকে চোখ পড়তেই আবার জ্ঞান হারায় সবিতা।

সবিতা অসুস্থ। তাই ডাক্তারের কথা মতো ভজহরি ও পাটাইয়ের সবিতার ঘরে ঢোকা বারণ। দিদি ঘুমোলে পাটাই দিদির কাছে বসে। ছেলের চোখের জল দেখে মালতী সান্ত্বনা দেন—যা শুয়ে পড়। দিদি ভাল হয়ে যাবে।

ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক হয় সবিতা।

ঘোড়সওয়ার ভূত

এক মাসও পেরোয়নি। আবার আর এক কাণ্ড। দুপুরে বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। গরম হাওয়া বইছে। ঘুম আসে না নিতাইয়ের। মনে হয় সেই ঘোড়সওয়ার পুতুলটার কথা। খুঁজলে কেমন হয়? দাদাকে ডাকে, এই দাদা, জঙ্গলে ঐ ঘোড়সওয়ার পুতুলটা খুঁজতে যাবি?

না। আবার তুই ঝগড়া শুরু করবি।

সত্যি বলছি, আর করবো না। নিয়ে নিস তুই।

বাবা যদি টের পায়?

চুপ করে যাব আর আসব।

নিঃশব্দে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় দু'জনে। ঝোপঝাড়ে ভরা মাঠ। সেখানেই ওদের বাবা ছুঁড়ে ফেলেছিল সেই পুতুলটা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা পাক খেয়ে তবে সেই জঙ্গলে আসতে হয়েছে।

এই দাদা, কি সুন্দর ঘাস ওখানটায়। ঐ দ্যাখ একটা ছোট্ট ছেলে। ওমা। কি সুন্দর একটা কালো ঘোড়া।

ওটাকে বলে টাট্টু ঘোড়া। মায়ের কাছে গল্প শুনিসনি? বলে পাটাই। চল ওর সঙ্গে কথা বলি।

দু'জনেই এগিয়ে যায়।

তুমি কোথায় থাক গো? পাটাই প্রশ্ন করে।

হাত নেড়ে বুঝিয়ে দেয় ছেলেটি যে, ও ওখানেই থাকে। অর্থাৎ ঐ মাঠে। নিতাই তাজ্জব বনে যায়। মাঠে কি কেউ থাকে? ছেলেটার হাতে কাজুফুল। সে ওগুলো কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে।

তুমি কি খাচ্ছ গো?

কাজুফুল।

কেমন খেতে?

পাটাই এবার এক ধমক দিয়ে নিতাইকে বলে, হ্যাংলা কোথাকার। ও কি খাচ্ছে তাতে তোর কি? ভাইকে বললেও নিজে এগোয় ছেলেটার দিকে। ঘোড়ার লোভেই যায়। জিজ্ঞেস করে, এই ঘোড়াটা কি তোমার?

'নাকু', মানে হ্যাঁ আমার।

কি সুন্দর ঘোড়া, তাই নারে দাদা।

পাটাইয়ের চোখে খুশির দৃষ্টি। বলে, হ্যাঁ।

এবার আলাপ জমাবার ইচ্ছায় ছেলেটার কাছে ঘেঁষে দু'জনে। কিন্তু ছেলেটা বাংলা জানে না। তাই হিন্দীতেই কথা হয়। হাত নেড়ে ইশারাতেও মনের কথা বোঝাতে চেষ্টা করে তিনজনে।

তোমার নাম কি?

'না পেরু রামণ'। আমার নাম রামণ।

হাসতে হাসতে পাটাই বলে, না পেরু পাটাই। মেরা ভাই, নিতাই।

রামণও হাসে পাটাইয়ের কথায়। বলে, ভাই কাদু। ভাই না। তমরু। 'না তমরু, তেলসিন্দা'?

ওর কথায় বুঝে নেয় পাটাই যে তমরু মানে 'ভাই'। আর তেলসিন্দা মানে 'জান'?

রামণ দারুণ খুশি। বলে, পাটাই তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান?

না ভাই। কাছ থেকে কখনও ঘোড়া দেখিনি। দূর থেকে ঘোড়ায় চড়া দেখেছি। তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান?

কেন জানবো না? এই দেখ।

হঠাৎ রামণ ঘোড়ায় চড়ে বসে। সাঁ সাঁ করে তীরবেগে ছুটল সে ঘোড়া। সবুজ ঘাসের গালিচা থেকে একেবারে শূন্যে উঠে গেল আকাশপথে।

এই দাদা, ঘোড়াটা হাওয়ায় পা ফেলে ছুটছে রে। তোর ভয় করছে না?

তুই একটা ভীতুর ডিম। ঝাঁসির রানীর ঘোড়ায় চড়া দেখিসনি? মনে হয় না শূন্যে লাফিয়ে চলছে?

সে তো ছবিতে। মাঠে এত ঘাস কোত্থেকে এল রে? একটু আগে তো এমনটা ছিল না?

মাঠে ঘাস থাকবে না তো কোথায় থাকবে? বোকা কোথাকার।

দাদার কথায় নিজেকে বোকা মনে করেনি নিতাই। মাথায় অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খেয়েছে। কেমন যেন গা ছমছমে ভাব এই দুপুরটায়। ওরা যেন একটা অজানা জায়গায় চলে এসেছে।

রামণ ঘোড়া নিয়ে নেমে এসেছে। সেই একই রকম সাঁ সাঁ করে। নিতাই-এর চকচকে ঘোড়াটা ছুঁয়ে দেখতে ভারি লোভ হয়। তাই সে রামণকে বলে, ভাই রামণ, তোমার ঘোড়াটায় একটু হাত দি?

কেন দেবে না? দাও না। ঘোড়ায় চড়বে?

না না। একটু হাত দেব।

নিতাই এগিয়ে গেছে ঘোড়ার কাছে। ঘোড়ার পিঠে হাত ছোঁয়াতেই ভয় পেয়ে যায় নিতাই। হিম বয়ে যায় শিরদাঁড়ায়। এ আবার কেমন ঘোড়া? পাথরের মতো শক্ত শরীর আর বরফের মতো ঠাণ্ডা গা। জ্যান্ত ঘোড়া এমন হতেই পারে না। নিতাইয়ের গলার স্বর কেঁপে ওঠে, এই দাদা, বাড়ি চল। বাবা জানলে কিন্তু মেরে ফেলবে।

এত তাড়াহুড়ো করছিস কেন? ঘোড়ায় চড়বো না?

না, চড়বি না। দাঁড়া, আমি বাবাকে বলছি। বলেই নিতাই দৌড়তে থাকে।

চলি রামণ। তুমি কি রোজই আস?

কাল আসব।

পাটাই ছুটে গিয়ে ধরে ফেলে ভাইকে। ধমকায় ওকে, তুই কেমন বল তো? যদি বা একটা বন্ধু জুটল, দিলি তো বাগড়া। দিদির শরীর ভাল নেই বলে এমনি মন ভাল নেই।

তুই তো তখন থেকে ঘোড়া ঘোড়া করছিস। একবারও সেই পুতুল ঘোড়াটার কথা বললি?

ঠিক বলেছিস তো নিতাই। থাকগে কাল আবার আসব। রামণের ঘোড়ায় চড়বো।

না। তুই ঐ ঘোড়ায় চড়বি না। ওটা ভাল ঘোড়া না।

আমি চড়বোই চড়বো।

ঠিক আছে, আমি বাবাকে বলে দেব।

আমিও বাবাকে বলে দেব তুই ঐ পুতুল ঘোড়াটা খুঁজতে আমায় ডেকেছিলি।

বাড়ির কাছে এসেই ঝগড়া থেমে যায়। পাটাই বলে, এই নিতাই, চল তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। এখুনি ভজুদা এসে যাবে। দু' ভাই ছুটে এসে ঘরে ঢুকে বিছানায় ঘুমের

ভান করে পড়ে থাকে। একটু পরেই সেখানে আসে ভজহরি। হাতে হরলিক্স-এর গ্লাস। ভজহরি ডাকে, পাটাই, নিতাই উঠে পড়।

তবুও নিঃশব্দ দু' ভাই। এমনটা তো হয় না। অন্যদিন ভজহরি এসে দেখে দু'জনে মারপিট করছে। সন্দেহ হয় তার। নজর যায় পায়ের দিকে। দু'জনের পা-ই কাদা মাখা।

কোথায় গিয়েছিলি তোরা?

আমরা তো ঘুমোচ্ছিলাম। পাটাই-নিতাইয়ের সাফ কথা।

ভজহরি ধমক দেয়, সত্যি করে বল কোথায় গিয়েছিলিস।

কোথাও যাইনি তো। কাঁদো কাঁদো গলা নিতাই-এর।

তাহলে কাদা কোথা থেকে এল? দাদাবাবুকে ডাকি।

ভয় পায় দু'জনেই। বলেই ফেলে কথাটা। তবে আসল ঘোড়ার কথা না বলে নকল ঘোড়া খোঁজার কথা বলে।

ভর দুপুরে বেম্মদত্যি থাকে। জান? ওরা কি করে?

ভয়ে মুখ শুকিয়েছে নিতাইয়ের। আসল ঘোড়ার কথা ভজুদাকে বলতে গেছে, অমনি দাদার এক চিমটি। থেমে গেছে নিতাই।

কী বলছিলি রে নিতাই? কোন ঘোড়া?

ঐ পাথরের ঘোড়া।

তাই বল। আমি ভাবি অন্যকিছু। যা, পা ধুয়ে আয়। রাজ্যের কাদা নিয়ে বিছানায় উঠেছে।

ভজহরি চলে যেতেই দাবড়ে ওঠে পাটাই, তুই একটা গাধা। ঐ ঘোড়ার কথা ভজহরিদাকে বলে?

ঠিক আছে যা। আমি গাধা। আর তুই পণ্ডিত। যা না, ঐ ঘোড়ায় চড়। ওটা তো ঘোড়া না, ভূত। নইলে অমন শক্ত আর ঠাণ্ডা হয়?

তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিদির মতো স্বপ্ন দেখছিলি।

ভাল। যা, তোর সঙ্গে আর যাব না। তোকে ঘোড়া ভূতে ধরুক।

মার খাবার ভয়ে চোঁ চাঁ দৌড় লাগায় নিতাই মার ঘরের দিকে। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়েই আবার কলঘরে ছোটে পা ধুতে।

ভূতের শয়তানি

সেদিন সন্ধ্যেবেলা থেকেই কারেন্ট নেই। হ্যারিকেনের আলোয় পড়তে বসেছে দু'ভাই। পাটাই বারবার হ্যারিকেনের ডাঁটির দিকটা নিতাইয়ের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। অসুবিধে হওয়ায় নিতাই অভিযোগ করে, অ্যাই দাদা, দেখতে পাচ্ছি না যে।

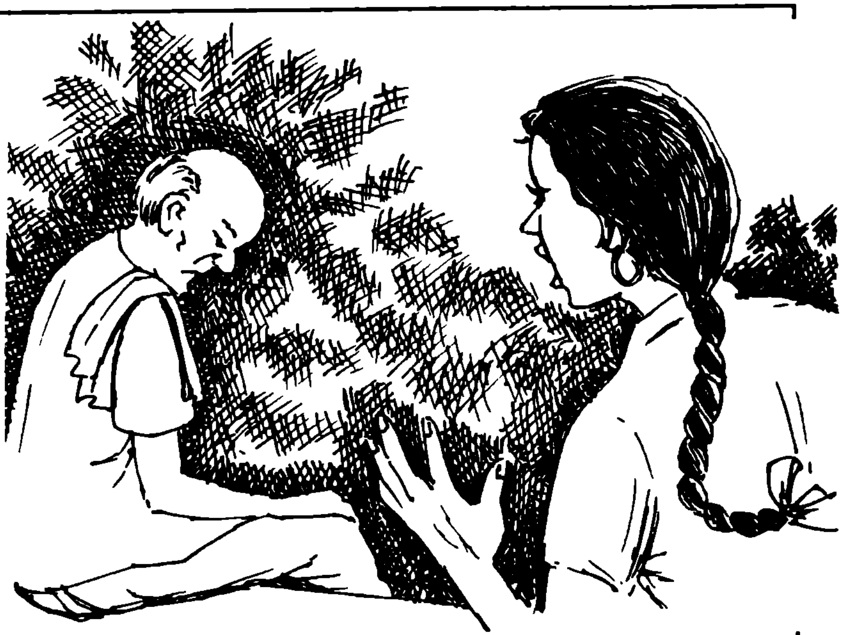

ঐ তো ভজহরি ঝিমোচ্ছে।

তোর থেকে আমার উঁচু ক্লাসের পড়া। বেশি আলোটা আমারই দরকার।

নিতাই চুপ করে গেল। ঝগড়া এগোল না। পাটাই উঠে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

দরজা বন্ধ করলি কেন? আমার ভয় করছে।

দরজা খোলা থাকলেই তো ভূত ঢুকবে। তাই বন্ধ করে দিলাম।

বইয়ের অক্ষর ভালমতো দেখতে না পাওয়ায় ঘুম পেয়ে যায় নিতাইয়ের। ঢুলতে থাকে সে। আচমকা চুলে এক টান লাগে। চটক ভেঙে যায়। চোখ চেয়ে নিতাই বলে, এই দাদা, চুল ধরে টানলি কেন রে?

আমি আবার কখন টানলাম? পাটাইও ঘুমে ঢুলছিল। নিতাইয়ের কথায় তাড়াতাড়ি সজাগ হবার চেষ্টা করে।

নিতাই শাসায়, এরপর চুল টানলে বাবাকে বলে দেব।

কিছুক্ষণ পর আবার চিৎকার। এবার পাটাইয়ের।

নিতাই তোর সাহস তো কম নয়। বড় দাদার চুল টানছিস? এক চড় মারব।

নিতাই কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, তুই-ই তো তখন থেকে আমার চুল টানছিস। আর এখন আমার নামে দোষ দিচ্ছিস। আমি বলে ঘুমাচ্ছি।

মিথ্যা বলিস না।

কে মিথ্যা বলছে? যতবার আমি ঢুলেছি, তুই চুল টানিসনি?

হঠাৎ-ই খ্যাঁক খ্যাঁক করে নাকি সুরে হাসির শব্দ কানে আসে। পাটাই ভাবে বুঝি নিতাই হাসছে। সে আরো রেগে বলে, তোর সাহস তো কম নয় নিতাই। অন্যায় করে আবার হাসছিস!

আমি হাসলাম? না তুই? ভূতের মতো নিজে হাসছে আবার আমাকে বলে।

কি আমায় ভূত বললি?

তোকে বলিনি। তোর হাসিটাকে ভূতের হাসি বলেছি।

ঠিক এই সময় দরজায় ধাক্কা পড়ে। ওপাশে গৌরকিশোরের গলা শোনা গেল, দরজা খোল। দরজা লাগিয়েছ কেন?

দরজা খুলে দিতেই চিৎকার করে ওঠেন গৌরকিশোর, কি হচ্ছে? এত হৈচৈ?

নিতাই নালিশ জানায়, দেখ না বাবা, দাদা আমার চুল টানছে। প্রতিবাদ করে পাটাই, না বাবা, নিতাই আমার চুল টেনেছে বারবার।

কিন্তু কেন ও তোমার চুল টানবে? জানতে চান গৌরকিশোর।

পাটাই বলে, ঘুম পাচ্ছিল, তাই মাথা

নিচু করে ঘুমোচ্ছিলাম। নিতাই চুল টেনে উঠিয়ে দেয়।

না বাবা, দাদার মাথায় আমি হাতই দিইনি। দাদাই আমার চুল ধরে টেনেছে।

মিথ্যে বলছে।

ছোট ছেলের চোখের জলে গৌরকিশোর বুঝলেন সে সত্যিই বলছে। এবার পাটাই-এর দিকে ফিরলেন। দেখেন পাটাইয়ের ঘা খাওয়া দৃষ্টি। তার মানে দু'জনের কথাই সত্যি। তবে কে চুল টানল?

ছেলেদের আশ্বস্ত করেন তিনি, এটা নিশ্চয়ই তোমাদের ভজুদার কাজ। মাঝের দরজা দিয়েই ভজু এসেছিল এ ঘরে।

ভজুর কথায় নিতাইয়ের চোখ-মুখ স্বাভাবিক হয়।

গট গট করে নিচে নেমে গেলেন গৌরকিশোর। রান্নাঘরে ঢুকে ভজহরিকে বললেন, তোকে নিতাই কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবি তুই ওদের চুল ধরে টেনেছিস।

সে কি কথা? আমি খোকাদের চুল টানব কেন? দেখগে টেনেছে কোন বেম্মদত্যি।

আরে বেম্মদত্যি নয়। ফাঁকা জায়গা তাই উল্টোপাল্টা ভাবে।

ভজহরি গলা নামিয়ে বলে, আমি বলি কি, দাদাবাবু এ বাড়িটা তুমি ছেড়ে দাও। সেদিন কেরোসিনের দোকানে শুনলাম......।

যত্তো সব আজগুবি গল্প। এই তোর জন্য ছেলেমেয়েগুলো অমন ভয়কাতুরে, যেতে যেতে শোনালেন গৌরকিশোর।

হ্যাঁ। তুমি তো কিছুই মাননি। যা খুশি কর। উত্তর দেয় ভজহরি।

রাক্ষুসে ভূত

চিন্তা ধরে ভজহরির। ভাবে ছেলেপিলেগুলোর কিছু যেন না হয়। কি যেন বলল দাদাবাবু?

এই যাঃ, ডালটা শুকিয়ে গেল। মাছের কালিয়া, ডাল আর ডিমের বড়া আজকের রান্না। বড়াটা বাচ্চাদের প্রিয়।

রান্নাঘরে বড়ার প্লেট আনতে গিয়ে দেখল মাত্র ক'খানা পড়ে আছে। কোথায় গেল অতগুলো বড়া? ভয় ধরে গেল ভজহরির। মনে পড়ল ছেলেদের চুল টানার কথা। কাঁপুনি আসছে তার। ভয়ে হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। নতুন করে বড়া ভাজার ক্ষমতা নেই ভজহরির। ভয়টা গ্রাস করছে তাকে। চারপাশে গরম হাওয়া পাক খাচ্ছে। গলায় জোর আনে ভজহরি।

সবিতা, পাটাই, নিতাই—তোমরা খেতে এস।

ছুটতে ছুটতে আসে সকলে।

কি করেছ ভজুদা?

খেতে বস। দেখতে পাবে।

কি রে ভজহরি, খাসা গন্ধ বেরিয়েছে যে। একি! বড়া এত কম কেন রে? গৌরকিশোরের কথার উত্তর দেয় না ভজহরি।

আর একটা বড়া দাও না ভজুদা। বলতে বলতে সবিতার চোখ পড়ে বড়ার প্লেটের ওপর। ভজহরিদার তো বড়া নেই! সেকথা মাকে বলতেই মালতী বলেন, সেকি! তোমার বড়া নেই! তিনি নিজের পাত থেকে তুলে দিতে যান। ভজহরি বাধা দেয়, না গো বৌ-ঠাকরুন, তুমি খাও। আজ আমার খাবার ইচ্ছা নেই।

গৌরকিশোর আন্দাজ করেন কিছু একটা হয়েছে। তাই সকলে ওপরে চলে গেলেও তিনি যান না। ভজহরিকে বলেন, নে তুই বসে পড়। আর খেতে খেতে বল আমায় কি হয়েছে?

এ বাড়িতে অপদেবতা আছে।

বাজে কথা বলিস না।

বাজে কথা নয়। চোদ্দটা বড়ার পাঁচটা রইল আর বাকিগুলো গায়েব। কে খেল?

বিড়াল এসছিল হয়তো।

হ্যাঁ। বিড়াল মানুষের মতো টপাটপ বড়া উঠিয়ে নিতে পারে? তুমি আমায় বিশ্বাস করনি?

তোকে বিশ্বাস করবো না কেন? তবে ভূতে বিশ্বাস নেই। অনেকে চাঁদনী রাতে কলাগাছকে বৌ ভেবে অজ্ঞান হয়ে যায়। ভাবে ভূত রয়েছে।

হঠাৎ-ই হি হি হাসির আওয়াজ। রাগে গৌরকিশোর চিৎকার করলেন, কে রে? বদমায়েশি করার জায়গা পাসনি?

ভাত ফেলে উঠে পড়ে ভজহরি। গৌরকিশোর বলেন, তুই দেখছি আমার মাথাটা খারাপ করে দিবি। তোর ভয় পেলে চলে? তাহলে ওরা কি করবে?

ঠিক আছে দাদাবাবু, এসব কাকখেও বলবো না।

ছাতে ভূতের নৃত্য

সে রাতে ভজহরি ছেলেদের ঘরে শোয়। নিতাই-পাটাই দিব্যি ঘুমোয়। কিন্তু ভজহরির চোখে ঘুম আসেনি। সারারাত ছাতে দত্যি-দানোর শব্দ। কান পাতা দায়। এক সময় মনে হয় যেন টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে কেউ। কখনও বা মড়াকান্না। মাঝে মাঝেই ওঠে কচি গলার মরণ আর্তনাদ—

'অ্যাঁই মো নেনু সচ্ পোইন্দি' (ও মা গো মরে গেলাম)।

ভজহরি....এই ভজহরি। বন্ধ দরজার বাইরে থেকে ডাকেন গৌরকিশোর। ভজহরি উঠে দরজা খোলে। বলে, তোমারে এত বললাম শুনলে না।

চুপ কর, ধমকে ওঠেন গৌরকিশোর। ছেলেদের দেখিস। কেউ ভয় দেখাতে চাইছে। টর্চটাও আবার জ্বলছে না। সকালে ব্যাটারি ভরেছি টর্চে। এই তো একটু আগে জ্বলল। এখন জ্বলছে না কেন?

হঠাৎ বিদ্যুতের মতো একটা আলোর স্রোত ঘরে ঢুকে গেল।

ভজহরি আঁতকে উঠল, দাদাবাবুগো।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি হবে। ভয় পাস না। ওদের নিয়ে ও ঘরে চল।

সারারাত চোখের পাতা এক হয় না গৌরকিশোর, ভজহরি আর মালতীর। ভোরের দিকে সব থামতে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিতাই গায়েব

ঘুম থেকে উঠেই পাটাই তাজ্জব। এ ঘরে কখন এল। ওর আর নিতাইয়ের তো অন্য ঘর। নিতাই তো পাশে নেই? অন্য বিছানায় দিদি ঘুমোচ্ছে। মা বিছানায় নেই। পাটাই উঠে বসেছে বিছানায়। মাকে ঘরে ঢুকতে দেখে পাটাই জিজ্ঞেস করে, নিতাই কোথায় গো মা?

কেন? ঝগড়াও করা চাই আবার কাছে না থাকলেও চলে না।

বল না কোথায় গেছে?

নিচে গেছে বোধহয়।

কোনোরকমে হাত-মুখ ধুয়েই নিচে ছুটেছে পাটাই।

ভজহরিদা, নিতাই কোথায় গো?

কেন, ওপরের ঘরে নেই?

না।

শুকনো গলায় ভজহরি বলে, সে কি? কোথায় গেল? উনোন থেকে কড়া নামিয়ে

রাখে ভজহরি। হাঁক-ডাক শুরু করে।

বাবার সঙ্গে যায়নি তো? নিচে নামতে নামতে সবিতা প্রশ্ন রাখে। মালতী কাঁদো কাঁদো গলায় ভজহরিকে বলে, ভজহরিদা, বাইরে একটু দেখবে? যদি সমুদ্রের দিকে যায়?

ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেছে ভজহরি।

বেশ কিছুক্ষণ হলো কারোরই পাত্তা নেই। ঘরে ঢুকলেন গৌরকিশোর সঙ্গে নন্দলাল বসু।

মালতী কেঁদে বলেন, নিতাইকে পাওয়া যাচ্ছে না।

মানে? চমকে ওঠেন গৌরকিশোর। ভজহরি কোথায়?

এরই মধ্যে ভজহরি ওঝাকে নিয়ে হাজির। গৌরকিশোর রেগে গেলেন, নিতাই কোথায়? পেলি না? তাই একে ধরে এনেছিস? উজবুক কোথাকার।

ও ভূত তাড়ায়।

এবার আমি ওকে তাড়াবো।

নন্দলাল গৌরকিশোরকে থামালেন। ওঝা ছুটে গেল তেঁতুল গাছটার দিকে। পাক খেতে লাগল তেঁতুল গাছটাকে। মুখে সমানে মন্ত্র বলে চলেছে।

এমন সময় নিতাই ছাতের সিঁড়ি ধরে নেমে এল। গৌরকিশোর ধমকে উঠলেন, মানা করেছিলাম না ছাতে যেতে?

দাদা তো আমায় ডেকে নিল।

ওমা, আমি আবার কখন ছাতে গেলাম, অবাক হয় পাটাই।

তুই পাটাইকে ছাতে দেখেছিস? গৌরকিশোর জিজ্ঞেস করেন।

হ্যাঁ, দাদা তেঁতুল গাছ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে আবার গাছে উঠেছে, নিতাই বলে।

বাবা, আমিও পাটাইয়ের মতো একটা ছেলেকে ছাতে দেখেছি। ঐ ছেলেটাই ভজুদার রূপ ধরে বসে বিড়ালছানা খাচ্ছিল। দেখে অজ্ঞান হয়ে যাই আমি। সবাই ভয় পাবে তাই বলিনি। ছাতে অনেক ছোট ছোট ঘর আছে, নারে নিতাই? বলে ওঠে সবিতা।

না। শুধু মাঠ আর তেঁতুল গাছ। আমরা ঘোড়ায় চড়ছিলাম। তাই নারে দাদা?

তুই ঐ সেদিনের ভূতটার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়েছিস।

ওঝার হুংকার বেড়ে যায়। 'ইক্কড়া পিশাচ উন্নদি' অর্থাৎ এখানে পিশাচ আছে। ঘর কেঁপে উঠছে সেই হুংকারে।

ধুনো ঝাঁটা সবই ভজহরি সাপ্লাই দিচ্ছে। নেশাগ্রস্তের মতো লাল চোখে শিকারের পেছনে ছোটে ওঝা। সিঁড়ি বেয়ে চলল। থমকে দাঁড়াল বন্ধ দরজায়। বহুদিনের সিল করা দরজা।

দিদি, দরজা তো বন্ধ। তুই আর নিতাই কি করে ছাতে গেলি রে?

বহুদিনের দরজা ভাঙা হলো। ময়লা ছাড়া ছাতে আর কিছু নেই। ওঝা আবার ছুটল। মন্ত্র পড়ছে, 'ওঁ হিং ইল্লু খালি কাওয়ালি (ঘর খালি চাই)। পিশাচ গারু ইদি চুরুন্তি (ভূত মশায় এদিকে দেখুন)। নেনু নউ তুরুস্তানু (আমি তোমাকে ঝাঁটাবো)। ওঁ হিং পিশাচ বেল্লু বেল্লু বেল্লু (পিশাচ চলে যা)।

শপাং শপাং করে ঝাঁটার বাড়ি পড়তে লাগল তেঁতুল গাছে। নাকি কান্না শোনা গেল,—'আঁই মো নেনু সচ্‌পো ইন্দি'। সঙ্গে সঙ্গে গাছ ভেঙে পড়ল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল গাছটা। টকাস করে ঘোড়সওয়ারী পুতুলটা পড়ল ছাতে। নিতাই আর পাটাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। পাটাই পুতুলটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেই আগুনে। তারপর নন্দলাল বসুর দিকে ফিরে বলল, নন্দকাকু, সচপোইন্দি কি গো?

মরে গেছি।

চুরুন্তি কি গো?

দেখুন।

এমা! ভূতকে কেউ আপনি বলে?

হাসে সকলে।

আপনি না বললে যদি ভূত ঘর না ছাড়ে তাই বলে। নন্দলালবাবু বলেন, তোর বাবাকে বলেছিলাম, এ বাড়িতে একটা ছেলে মারা যায়। যে-ই আসে এখানে ভূতটা তাদের বড় জ্বালায়।

নিতাইয়ের চোখে ভয়ের দৃষ্টি দেখে আবার বলেন, আর ভয় নেই। সেই ছেলেটা চলে গেছে। গাছটাও মরে গেছে। বল, আজ কোথায় বেড়াতে যাবি।

লাইট হাউজ। চিৎকার করে বলে নিতাই-পাটাই।

ছবি : সুবল সরকার

নানা স্বাদের বই

অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মুখোশ ১৬.০০
মুখোশের আড়ালে ও কে? মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে গোটা দেশ ছটফট করছে জানার জন্য কিন্তু...

তীরন্দাজ ১৮.০০

রাধারমণ রায়ের
রণডাকাত ২৬.০০
দুর্ধর্ষ রণডাকাতের লোমহর্ষক কাহিনী

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুর্গপাহাড়ে বন্দী ২০.০০

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর
ফাঁসি ২৫.০০
ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে আসার দুর্দান্ত কাহিনী, সঙ্গে ফাঁসুড়েদের সচিত্র সাক্ষাৎকার।

অপারেশন এক্স ৩০.০০

চিত্তরঞ্জন মাইতির
রুরু ৩৫.০০
এক নির্ভীক কিশোরের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

সুভাষ ধরের
বুদ্ধমূর্তির সন্ধানে ৩০.০০

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের
সোনার মেডেল ২০.০০

উপন্যাস

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দেবী ৩৬.০০
মন্দিরে বিগ্রহ নেই, আছে একটি পদচিহ্ন।

আনন্দ বাগচীর
অদৃশ্য মৃত্যুর হুক ৪০.০০

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর
ডাক্তারের ডায়েরি ৩৫.০০
ডাক্তারদের ডায়েরি ভরা থাকে বিচিত্র সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ফসলে। ঘটনাগুলি সব-ই সত্যি।

শিপ্রা দত্তর
গেস্ট হাউসের ডায়েরি ৪০.০০
গেস্ট হাউসের মধ্যে কী হয়—সেক্স, ভায়োলেন্স, সাসপেন্সের টানটান কাহিনী।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

কেরিয়ার গাইড

ডি. এ. চন্দ্রণ

যদি হই জার্নালিস্ট

তোমরা হয়তো অনেকেই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছ, এমনকি স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছো যে বড় হয়ে 'সাংবাদিক' হবে। সাংবাদিক হতে গেলে নিজেকে ভালভাবে তৈরি করতে হবে। তৈরি করা মানে ঠিক দৈহিক কসরৎ নয়। জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হবে—বলিষ্ঠ ভাষায় ভাবকে প্রকাশ করার কেরামতি রপ্ত করতে হবে। হ্যাঁ, একেবারে দৈহিক পরিচর্যার প্রয়োজন নেই, সেটা বলাও ঠিক নয়। সম্প্রতি তোমরা দেখেছ—উগ্রপন্থীদের হাতে পড়ে মার্কিন সাংবাদিক পার্লকে মৃত্যুবরণ করতে হলো। এরকম অনেক ক্ষেত্রেই সাংবাদিককে সংবাদ সংগ্রহ করতে কিংবা রসদ সন্ধানে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি বহন করতে হয়। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমন জীবনসংশয়ের ভয় থাকে তেমনি যুদ্ধ বা হানাহানির সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েও অনেককে প্রাণবলি দিতে হয়। তাহলে শারীরিকভাবে সুস্থ-সবল থাকারও প্রয়োজন আছে। নাহলে প্রতিকূল পরিবেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ সংগ্রহের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হবে না।

স্কুলজীবন থেকে ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজি, বাংলা কিংবা হিন্দী বিষয় বেশ ভালভাবে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস ভালভাবে জানা না থাকলে সংবাদ উপস্থাপনা, পরিবেশনা, সমালোচনা করা বেশ শক্ত কাজ! দেশ-বিদেশের ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি যত পড়া থাকবে, সাংবাদিকের লেখনী ততোই বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। সাংবাদিকের প্রখর দৃষ্টি, তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতা, তাঁর দূরদৃষ্টি দেশে জনমত গঠনে দারুণ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। যে লেখার মধ্যে মানুষের সঙ্গে মনের টানের কথা থাকে—তাদের ভাবাবেগ, চাওয়া-পাওয়া-বঞ্চনা ভাষা পায় সেই লেখাই হয়ে ওঠে সার্থক প্রতিবেদন কিংবা নিবন্ধ।

অনেকেই আমাদের কাছে চিঠি লিখে জানতে চায়—সাংবাদিক হতে গেলে কী করতে হবে? সারা পৃথিবীতে অনেক ঝানু সাংবাদিক আছেন যাঁরা সাংবাদিকতার কেতাবী পাঠক্রম নেননি অথচ তাঁরা নমস্য সাংবাদিক। স্নাতক হওয়ার পর সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশোনা করা যেতে পারে। এমনকি রেডিও, টিভি জার্নালিজম দেখে বা শুনে শুনেও অনেকটাই রপ্ত করা যায়। ভাল সংবাদপত্র পাঠের অনুশীলন দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত রাখলে প্রতিবেদন রচনা বিষয়ে যেমন সম্যক ধারণা লাভ করা যায় ঠিক তেমনি সম্পাদকীয় নিবন্ধ পড়লেও এই লেখার মুন্সীয়ানা, বিষয় বৈচিত্র্য, কাঠামো সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্ম নেয়।

এখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর স্নাতক পর্যায়ে সাংবাদিকতা বিষয়ে পাঠ নেওয়া সম্ভব। স্নাতকোত্তর পাঠক্রম হিসাবেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম চালু আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজমে এম. এ. পড়ার সুযোগ আছে। এরকম সুযোগ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও বহাল আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম কোর্সে ভর্তি হতে হলে অবশ্য ভর্তির পরীক্ষায় বসতে হয়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও জার্নালিজমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তারা রেডিও কিংবা টিভিতে সংবাদপাঠ, ভাষ্যপাঠ যেমন শেখায় তেমনি কীভাবে সংবাদ বা ভাষ্য লিখতে হয় সে বিষয়েও শিক্ষা দিয়ে থাকে। একইভাবে লেখা কীভাবে এডিট করতে হয়, প্রুফ কীভাবে দেখতে হয়, সবকিছুরই প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের মধ্যে থাকে। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে কাজ শিখে তালিম নিলে এ-বিষয়ে সহজেই পারঙ্গম হওয়া যায়।

সারা দেশে সাংবাদিকতার পাঠক্রমের জন্য অনেক সরকারি/বেসরকারি সংস্থা রয়েছে। এসবের মধ্যে সর্বভারতীয় স্তরে একটি প্রখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম হলো ঃ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন। এখানে পড়ানো হয় পাঁচটি কোর্স। যেমন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স ইন জার্নালিজম (ইংলিশ), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স ইন জার্নালিজম (হিন্দী), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স ইন রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন জার্নালিজম, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স ইন জার্নালিজম (ওড়িয়া, উর্দু), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স ইন অ্যাডভারটাইজিং অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস ইত্যাদি। এসব কোর্সে ভর্তি হতে গেলে অবশ্যই গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। মাধ্যমিক পাশ করেই সাংবাদিকতা পড়া যাবে না। বরঞ্চ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর স্নাতক পর্যায়ে বিষয় হিসাবে সাংবাদিকতা বা জার্নালিজম নিয়ে পড়ার সুযোগ আছে।

এতোক্ষণ আমরা যে ইনস্টিটিউট নিয়ে আলোচনা করলাম—এদের কেন্দ্র রয়েছে ওড়িশার ঢেনকানলে এবং নয়াদিল্লিতে। প্রবেশিকা পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি বেরোয় সাধারণত ভারত সরকারের এমপ্লয়মেন্ট নিউজ সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবং বিশেষ কতকগুলো জাতীয় সংবাদপত্রে। মনোনীত প্রার্থীদের স্টাইপেন্ড দেওয়া হয় এবং পড়া শেষে আকর্ষণীয় বেতনে নিয়োগের সুযোগও পাওয়া সম্ভব। যোগাযোগের ঠিকানা—রেজিস্ট্রার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন, অরুণা আসফ আলি মার্গ, জে. এন. ইউ. ক্যাম্পাস, নয়াদিল্লি—১১০ ০৬৭। এবছর দুশো টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট পাঠিয়ে (আই আই এম সি অনুকূলে নয়াদিল্লির যে কোনো ব্যাঙ্কের ওপর কাটা) প্রসপেক্টাস বা ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে ১২ এপ্রিলের মধ্যে। ইচ্ছুক প্রার্থীদের মনে রাখতে হবে, সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়ে থাকে।

তাহলে এখন থেকে তালিম নেওয়া শুরু করা যাক। ইংরেজি/বাংলা ভাষায় লেখার সময় বাক্যগঠন বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে হবে। শুদ্ধ বানানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কল্পনাশক্তি/ইমাজিনেশন ব্যাপ্তি ঘটাতে হবে। ইংরেজি/বাংলা/হিন্দী ভাষায় লেখার অনুশীলন করতে হবে। সেই সঙ্গে এইসব ভাষায় প্রকাশিত ভাল লেখকের বই পড়তে হবে—রচনাশৈলী আর প্রকাশ মুন্সিয়ানা শেখার জন্য।

দাদাঠাকুরের রসিকতা

ডঃ অর্চনা মণ্ডল

দাদাঠাকুরের আসল নাম শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। পোশাকী নামটি দাদাঠাকুরের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। দাদাঠাকুর সন্দেহ করতেন তাঁর ছেলেমেয়েরাও হয়তো আড়ালে তাঁকে দাদাঠাকুর বলে ডাকে।

দাদাঠাকুর অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রবল। তিনি চাকরি করার চেয়ে উপোস থাকাও ভাল মনে করতেন। সেকালে এন্ট্রান্স (বর্তমানে মাধ্যমিক) পাশ করেছিলেন তিনি। ইচ্ছা করলে চাকরি জুটিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে শক্ত ছিল না। কিন্তু ইংরেজ শাসনকালে গোলামের দেশে গোলামি করতে তাঁর রুচি ছিল না। তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকার পথ নির্বাচন করে নিলেন ছাপাখানা ও সংবাদপত্র সম্পাদনার মাধ্যমে। 'জঙ্গীপুর সংবাদ', 'বিদূষক পত্রিকা', 'বোতল-পুরাণ' তিনি প্রকাশ করেন। নিজে কম্পোজিটর থেকে এডিটরের সব কাজ সম্পন্ন করতেন। আবার পায়ে ঘুঙুর বাঁধা, মাথায় পাগড়ি, চানাচুর ফেরিওয়ালার বেশে তাদের মতো ছড়া কেটে কলকাতার পথে পথে সেসব বই ফেরি করতেন। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনকে কতখানি মূল্য দিতেন, ছাত্রদের এক পারিতোষিক বিতরণসভায় প্রদত্ত ভাষণে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ছাত্রদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন—

তোমরা যেন governed by the preposition coachman হয়ো না। নিজের পায়ের ওপর, নিজের মনের ওপর নির্ভর করে চলবে।

দাদাঠাকুর 'জঙ্গীপুর সংবাদ' ও 'বিদূষক'-এ পণপ্রথা, কুলিদের ওপর অত্যাচার, সরকারী অর্থের অপব্যবহার জাতীয় নানা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর অস্ত্র তাঁর লেখনী। যেখানে দুর্নীতি, অনাচার, অবিচার দেখতেন সেখানেই তার প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হতেন। পুজোর জন্য তিনি একটি আগমনী কবিতা লিখবেন ভাবছেন এমন সময় লাঠি হাতে কতগুলো হিন্দুস্থানী মোটবাহক সেখানে এসে মোট নামাল বিশ্রামের আশায়। এরা সবাই জমিদার বাড়ির চাকর। দাদাঠাকুর ওদের কাছে নানা প্রশ্ন করে জানতে পারলেন তারা চুপড়ি ভরতি লাউ-কুমড়ো প্রজাদের বাড়ি থেকে আদায় করে রাজবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে পুজোর জন্য। পুজোতে ওরা খেতে পাবে কিনা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন মোটবাহকরা সারাদিন মুড়ি খেয়ে কাটাবে। তারপর ভোজের শেষে সবার উচ্ছিষ্ট যা থাকবে তাই খাবে। তাঁর চোখের সামনে সমস্ত ছবিটি ফুটে উঠল। জবরদস্তি চালিয়ে সংগ্রহ করা প্রজার বাড়ির জিনিস দেবী কি করে গ্রহণ করবেন? এ সবই তো দীনদরিদ্রের চোখের জল। 'আগমনী' গান লেখা হয়ে গেল—

রাজার বাড়ি পূজার ধুম এলেন দশভুজা
প্রবৃত্তি হলো না কিন্তু নিতে রাজার পূজা।

....

প্রজার বাড়ির কুমড়ো শসা
প্রজার বাড়ির কলা
ঘৃত দধি দুগ্ধ সব গোয়ালা বাড়ির তোলা।
মা বললেন, এ পুজোতে
নাইকো কোনো ফল
রাজবাড়ির সব জিনিসই দীনের আঁখি জল।

দাদাঠাকুরের বেশভূষা তাঁকে একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। তিনি প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অতি সাধারণ বেশ ব্যবহার করতেন। এ বিষয়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায়ের অনুসরণ করতেন। তার সঙ্গে কিছু নিজস্ব খেয়াল যোগ করে বেশকে আরো বিচিত্র করে তুলেছিলেন। পণ্ডিতদের পাদুকা ধারণে বাধা নেই কিন্তু তিনি খালি পায়ে চলতেন। জিজ্ঞাসা করলে কৌতুক করে বলতেন, বাগদাদের রাজারও তো খালি পা (Khalifa)।

দাদাঠাকুর বেতারে পল্লীমঙ্গল আসরে ও শিশুমহলে গল্প বলে আসর জমজমাট

রাখতেন। সেকালে বেতারের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে পার্টির আয়োজন করা হতো। তাতে অনেক ইউরোপীয় আর কলকাতার নামজাদা ও পদস্থ ব্যক্তিরা আসতেন।

একবার ১নং গারস্টিন প্লেসে একটি পার্টির আয়োজন হয়েছিল। দাদাঠাকুর আমন্ত্রিত হয়ে তাঁর চিরাচরিত বেশে সেখানে আসেন। তাঁকে দেখে সহকারী স্টেশন-ডিরেক্টর বিরক্তভাবে বলেন—আচ্ছা দাদাঠাকুর, আজকে একটা পার্টি হচ্ছে আর আপনি খালি গায়ে, খালি পায়ে চলে এলেন? এঁরা পদস্থ ব্যক্তি, কি ভাববেন বলুন তো? দাদাঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, পদস্থ আবার কে? এরা তো সবাই জুতোস্থ। পদস্থ বলতে গেলে এখানে একমাত্র আমিই সেই ব্যক্তি, নয় কিনা বলুন? প্রতিবাদকারী এর উত্তরে আর কী বলবেন ভেবে না পেয়ে হতাশস্বরে বলে উঠলেন, আপনার সঙ্গে তো কথায় পারবার যো নেই, যান বসুন গে।

দাদাঠাকুরের সঙ্গে সমসাময়িক খ্যাতনামা ব্যক্তিদের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়েরও ছিল। ওঁরা উভয় উভয়কে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। উভয়েই অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে গেছেন। বাঙলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯৩৭-৪২) থাকাকালীন তাঁদের পরিচয় হয়। হরেন্দ্রকুমারের শিক্ষক-সুলভ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার জন্য তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হন। শিক্ষার উন্নতির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা দান করেন।

ডঃ মুখোপাধ্যায়কে দাদাঠাকুর একদিন বলেছিলেন, আপনার নাম ভুল। আপনি যা উপার্জন করেন সব দান করেন, অথচ নাম আপনার হরেন। আপনি তো হরণ করেন না।

কাপড় লাট হলে কদর কমে আর মানুষ লাট হলে কদর বাড়ে, হরেন্দ্রকুমারকে উদ্দেশ্য করেই দাদাঠাকুর এই উক্তি করতেন।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের আমন্ত্রণে দাদাঠাকুর মাঝে মাঝে রাজভবনে যেতেন। হরেন্দ্রকুমারের নির্দেশ ছিল—দাদাঠাকুর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে যেন পথরোধ না করা হয়। স্বচ্ছন্দে ও বিনা দ্বিধায় যেন তিনি তাঁর কাছে আসতে পারেন।

এমনি একদিন দাদাঠাকুর দেখা করতে

এসেছেন। হরেন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার এখানে আসতে অসুবিধা হয়নি তো?

দাদাঠাকুর জবাব দিলেন, না, একজন 'নরকের সাথী' আমাকে আপনার ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেছে।

নরকের সাথী? হরেন্দ্রকুমার বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, তার মানে?

দাদাঠাকুর বললেন, ঐ যে যাদের মাথায় 'হেলমেট' (Helmet) থাকে তাদেরই তো 'নরকের সাথী' বলা হয়। 'হেল' মানে নরক, 'মেট' মানে সাথী।

হেলমেটের অভিনব ব্যাখ্যা শুনে হরেন্দ্রকুমার হো হো করে হেসে উঠলেন।

দাদাঠাকুর ছিলেন ভাষার জাদুকর। তিনি বলতেন, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বিশ্বের বিদ্যা যেখানে আসিয়া লয় হয়....Moralist-দের নাম এখন পাওয়া যায় মরা-লিস্টে... Teacher এবং Cheater একই বর্ণগুলির ওলট-পালট মাত্র।

দাদাঠাকুরের প্রত্যেক সহজ কথার পানিং করার ক্ষমতা ছিল। এ বিষয়ে তিনি শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে তুলনীয়। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে দেশে ধান হলো না। দাদাঠাকুর বললেন, যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বি-ধান সেখানে ধান হবে কেমন করে?

দাদাঠাকুর মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন, মুখের হাসি মুখেই আছে। বাড়ির ডাক্তার এলেন। তাঁর নাম মণি (গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়)। দাদাঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, ওটি কে? কে যেন উত্তর দিল, মণি ডাক্তার এসেছেন। দাদাঠাকুর বোধহয় শেষ কথা বললেন, No more money needed.

ছবি : বিজন কর্মকার

মনের জানলা

জগদিন্দ্র মণ্ডল

[অধ্যাপক, ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্তন ডিন (বিজ্ঞান) কলকাতা বিশ্ববিদল্যায়]

প্রশ্ন : *আমি 'শুকতারা'র অন্তর্গত 'মনের জানলা'র একজন Fan. বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে আপনি যে সদুপদেশ দিয়ে থাকেন, তাতে সত্যিই আমি মুগ্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমি আপনার 'মনের জানলা'র সান্নিধ্যে অনেক আসার চেষ্টা করেছি এবং করছি অর্থাৎ বেশ কয়েকবার আমি প্রশ্ন পাঠিয়েছি, কিন্তু এখনও তার কোনো উত্তর পাইনি। কিন্তু মন বলে যে, আমার উত্তর একদিন আসবেই। তাই আমি আমার প্রশ্ন আপনার নিকট আবার পাঠাচ্ছি এবং আশা রাখছি যে, এবার আমার চিঠি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে, আমার উত্তর (যার জন্য আমি খুব উৎসুক) আমি পাবই।*

আমি একজন স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় বছরের ছাত্র। পড়াশুনা করার আমার খুব আগ্রহ। আমি পড়াশুনায় অসাধারণ রেজাল্ট করতে চাই এবং আমি মনে করি আমার সেই capacity আছে। আমি ইংরেজি অনার্সের ছাত্র। আমি মনে করি সারাদিন পড়াশুনা করে ভাল রেজাল্ট করব। আমার পড়াশুনা করার খুব ইচ্ছা। কিন্তু দেখি, ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই, বাড়িতে এসে বই-এর টেবিলে বসলেই আমার সব ইচ্ছা কোথায় যেন চলে যায়। আর কোথায় কি করলাম, না করলাম, সব চিন্তা আমার মাথায় চলে আসে। ফলে আমি আমার আশানুযায়ী রেজাল্ট করতে পারি না। আমার মার আমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন, খুব আশা। আর মাকে আমি খুবই ভালবাসি। আমি একজন খুব গরীব ছাত্র। পড়াশুনা ভাল করে না শিখলে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, মায়েরও কষ্ট হবে। মায়ের আশা পূর্ণ করতে না পারলে আমি খুবই কষ্ট পাবো। আপনার সদুপদেশে যদি আমার এই সমস্যা দূরীভূত হয়, তবে আমি সত্যি খুব উপকৃত হব।

—গোপাল সরকার, সাপট গ্রাম, অসম।

উত্তর : তুমি শুকতারা নিয়মিত পড় জেনে খুশি হলাম। মনের জানলার উত্তর তোমাকে মুগ্ধ করে, এটা জেনেও আমরা আনন্দিত। কিন্তু এর আগে অনেকবার চিঠি দিয়েও তুমি উত্তর পাওনি, তোমার এই অভিযোগের দুঃখের সঙ্গে আমরা সহমর্মী। এর জন্য আমরা এক ধরনের অক্ষমতায় ভুগি। এত চিঠি 'মনের জানলা' বিভাগের জন্য তোমাদের কাছ থেকে আসে, অথচ সেই তুলনায় 'শুকতারা' মাসিক পত্রিকায় আমরা তোমাদের জন্য খুব বেশি হলে দু'পৃষ্ঠা জায়গা দিতে পারি, ফলে ইচ্ছা থাকলেও তোমাদের সকলের চিঠির যথাসময়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। এই অপারগতার জন্য আমরা দুঃখিত। তবে চেষ্টা করা হয় একই ধরনের সমস্যার অনেকগুলি চিঠি থেকে, একটি/দুটি চিঠির উত্তর দিয়ে, সেই সমস্যা সমাধানের পথটির সঙ্গে মোটামুটি সকলকে অবহিত করে দেওয়া।

এইবার তোমার সমস্যার কথায় আসি। আমি তো সেই অর্থে তোমার কোনো সমস্যা দেখি না। "উচ্চাভিলাষই মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি।" তোমার যখন উচ্চাভিলাষ আছে এবং তার সঙ্গে আছে একটি সুন্দর পবিত্র ইচ্ছা—মার মুখে হাসি ফুটাবার, মার তোমাকে নিয়ে যে স্বপ্ন তাকে বাস্তবায়িত করার—তখন জেনো, শক্তি তুমি পাবেই। মনের সৎ ইচ্ছা মনের শুভশক্তিকে জাগ্রত করে, সংহত করে। লিখেছ তুমি পড়াশুনায় 'অসাধারণ' result করতে চাও; অসাধারণ কথাটি আপেক্ষিক (relative)। ইংরেজি Hons. নিয়ে তুমি পড়ছ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া যেমন একটি ভাল ফল, তেমনি আবার দ্বিতীয় শ্রেণীতে শতকরা ৫৫% নম্বর পাওয়াও ভাল ফল। সবাই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হবে না। নিহিত শক্তি-সামর্থ্য (Aptitude) ও নিয়মিত আন্তরিক পরিশ্রমে, সেই নিহিত শক্তির বাস্তবায়িত রূপায়ণই সাফল্য আনে। তোমার capacity আছে—এই বিশ্বাস বা confidence সাফল্যের প্রথম উপাদান। এর সঙ্গে চাই অনুশীলন। এই অনুশীলনেরও বিজ্ঞাননিষ্ঠ পঠন-পাঠনের পর্যায় আছে। Class-এ যা পড়ানো হয়, সেটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে, কোনো প্রশ্ন থাকলে বা আরও ব্যাখ্যার অবকাশ থাকলে, অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সেটা ভালভাবে বুঝে নেবে—ক্লাসের বাইরে। প্রতিটি বিষয়ে Text বই ভাল করে পড়বে, Note করবে, প্রশ্নোত্তর তৈরি করবে—Reference বই পড়বে। প্রশ্নোত্তর লিখে অধ্যাপকদের দেখাবে। ভাষা সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য প্রথম চাই সনিষ্ঠ সাহিত্য পাঠ—বিশেষ করে Text বই মনোযোগ দিয়ে পড়া, শব্দভাণ্ডার বাড়ানো, সাহিত্য বোধের সমৃদ্ধি। শুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাবে লেখার নিয়মিত অভ্যাস করা। সাহিত্যপাঠের বিজ্ঞাননিষ্ঠ অনুশীলন এভাবেই করতে হয়। সাহিত্যের মধ্যে, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের মধ্যে আপাত কঠিন আবরণের তলায় (যাকে মনোযোগ দিয়ে, অধ্যবসায় দিয়ে আবিষ্কার করতে হয়) যে রসসম্ভার আছে তার আস্বাদন করার মধ্যেই সাহিত্যের ছাত্র হওয়ার আনন্দ। তুমি সেই আনন্দের সন্ধান কর, দেখবে পড়া তোমার মনকে আকৃষ্ট করছে। পরীক্ষার ফলও আশানুরূপ হবে—তোমার উচ্চাভিলাষ পূরণ হবে, তোমাকে নিয়ে মায়ের স্বপ্নও সফল হবে। তোমার উপর আমাদেরও আস্থা আছে।

চোরের আবার ভূতের ভয়!

আশাপূর্ণা দেবী

[শুকতারার বয়স ৫৫ বছর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে বাংলার যশস্বী সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই শুকতারায় লিখেছেন। 'ফিরে দেখা' বিভাগে আমরা শুকতারার পাতা থেকে এক এক করে তুলে আনবো বাংলার শিশুসাহিত্যের কিছু মণি-মাণিক্য। শুকতারার শারদীয়া সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে এই পর্ব। এই সংখ্যায় ছাপা হচ্ছে আশাপূর্ণা দেবীর লেখা গল্প 'চোরের আবার ভূতের ভয়!'। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল শুকতারার ১২শ বর্ষ ২য় সংখ্যায় অর্থাৎ চৈত্র ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে।]

"নাঃ, ব্যবসা-ট্যাবসা আর চলবে না—" হারু বললো তার বন্ধু গদাইকে—"লোকেরা বেজায় চালাক হয়ে গেছে, সহজে আর অসাবধান হয় না।"

"যা বলেছিস ভাই—" গদাই নিশ্বাস ফেলে বলে, "তুই তো এক পুরুষে সিঁদেল, আমরা বাপ-ঠাকুদ্দার আমল থেকে তিন-পুরুষে এই কাজ করে আসছি। কিন্তু ব্যবসা এমন কানা পড়ে যায়নি কখনো। দেখ না কেন সেকালের বাড়িগুলোর দেয়াল তৈরী হ'ত ইঁট চুন সুরকি দিয়ে, তাতে সিঁদ চালানো চলতো। দু'হাত পুরু দেয়াল অক্লেশে এফোঁড়-ওফোঁড় করেছি। আর এখন? এখনকার দেয়ালগুলো যেন বজ্জর! ফোঁড়ে কার সাধ্যি!"

"কংক্রীটের কিনা!" বললো হারু।

"আরে বাবা, সে তো আমিও জানি—" গদাই রেগে উঠে বলে, "কথা হচ্ছে পেটে পিঠে যে কংক্রীট হয়ে যাচ্ছে তার কি?"

"—কি আর—" হারু উদাসভাবে বলে—"স্রেফ হরিমটর! আমি তো আজ দু'দিন শুধু ঝাল ছোলা খেয়ে আছি।"

"আর আমিই যেন কালিয়া পোলাও খাচ্ছি!" গদাই খেঁজে উঠে বলে।

"আহা রাগারাগির দরকার কি—" হারু বলে, "আমি বলি কি—শহর ছাড়িয়ে একটু এদিক ওদিক দেখলে হয় না?"

"কেন, শহর ছাড়িয়ে এদিক ওদিকের লোকের খুব পয়সা আছে বুঝি? না কি তারা আমাদের জন্যে রাতে দরজা খুলে রেখে দেয়?"

গদাই বরাবরই একটু রোখা, হারু ওরই মধ্যে একটু ঠাণ্ডা মেজাজ। বহুদিন থেকে দু'জনে একত্রে যুক্তি-পরামর্শ ক'রে 'জগতের সেরা ব্যবসাটি' চালিয়ে আসছে। কিন্তু ইদানীং ব্যবসা বড়ই মন্দা। এখন বড়লোকের বাড়ির দেয়াল-টেয়ালগুলো সব কংক্রীটের, উঠোনের পাঁচিলগুলো দু'মানুষ ভোর উঁচু, তাও একটু কোথাও ফাঁকা থাকলো তো কাঁচের টুকরো পুঁতছে, তারের জাল ঘিরছে, আরো কত কি। কোন্ ফাঁক দিয়ে তবে চুরি-কার্যটি সেরে নেবে এরা?

বেচারাদের ওইটাই তো জীবিকা?

হাসছো? আহা চোররা কি মানুষ নয়? খাবে না ওরা?

হারু বলে, "তা' বলছি না, তবে ওসব দিকে বাড়িগুলো পুরনো-টুরনো, সিঁদ-কাঠিতে কাজ হতে পারে।"

গদাই মুখখানা সিঁটিয়ে দু'হাতে গা চুলকোতে চুলকোতে বলে, "কাজ আর ছাই হবে! চল দেখি, আজ পুল পেরিয়ে চেৎলার ওদিকে চলে যাই।"

"কিছু সন্ধানে আছে নাকি?" হারু বলে মহোৎসাহে।

গদাই ভারী মুখে বলে, "সন্ধানে টন্ধানে কিছু নয়, তবে বলছিল রেমোটা ওখানে নাকি—।"

হারু বলে, "বাঃ, রেমো সন্ধান দিচ্ছে? তা' সে নিজে কেন চেষ্টা করছে না?"

"সে? তাকে জেল থেকে এসে অবধি এখন রোজ রাত্তিরে থানায় গিয়ে হাজরে দিতে হচ্ছে।"

হারু একটা বিরাট নিশ্বাস ফেলে বলে, "তা' হবে বৈ কি! আমরা বেচারারা গরীব চোর কি না? আর এই রাজ্য জুড়ে যে কত চুরির কারবার চলছে—তার লেখা-জোখা আছে? কি ক'রে বুদ্ধি খাটিয়ে চুরিটি করবে এই চিন্তায় যত বুদ্ধিমান মাথা খাটছে, তা'তে কোন দোষ নেই কেমন? তারা যে বড়লোক চোর।"

গদাই ফের রেগে ওঠে, "আরে বাবা রাখ, তোর বড় বড় কথা! কত রাত্তিরে বেরুবি তাই বল।"

হারু বলে, "যেমন বেরোই, রাত একটা-দেড়টা।"

"আচ্ছা।"

রাত দেড়টা নাগাদ চেৎলার পুলের ওদিকে দুই বন্ধু মিলিত হল। যথারীতি পরনে একটা ছোট হাফ প্যান্ট, সর্বাঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে তেল মাখা, মুখে ভুষোর কালি ঘষা। এই সাজ ক'রে আর মা কালীর নাম স্মরণ ক'রে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল গভীর অন্ধকারে।

তা' আজকে ওদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন! হঠাৎ দেখল একটা পুরনো পুরনো কিন্তু বেশ বড় বাড়ির খিড়কির দরজাটা খোলা পড়ে রয়েছে।

"জয় মা কালী!"

বললো হারু ফিসফিস করে, "মনে হচ্ছে মা আজ মুখ তুলে চাইবেন।"

গদাই বলে, "চুপ। টুঁ শব্দটি নয়।"

মস্ত বড় বাড়িটা কত ঘর দরজা দালান, সব ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

আস্তে আস্তে, দু'জনে সুড়ুৎ ক'রে খোলা দরজা দিয়ে দালানে ঢুকে পড়ে! দালান থেকে ঘরে! আশ্চর্য আশ্চর্য। পর পর সমস্ত দরজাগুলোই খোলা। এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড জীবনে কখনো দেখেনি ওরা! স্বয়ং ভগবান কি হারু-গদাইয়ের দুঃখে বিগলিত হয়ে একে একে সব কপাট খুলে রেখেছেন? তাহলে ভাগ্যের কপাটও খুলে যাবে নাকি এবার?

হারু বাতাসে পাতা নড়ার মত ফিসফিসিয়ে বলে, "কি রে গদা, হানাবাড়ি-টাড়ি নয় তো? আমার কিন্তু কেমন ভয় করছে।"

"থাম হেরো—" গদাই দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, "চোরের আবার ভূতের ভয়! আমার বিশ্বাস, যে ব্যাটা দোর বন্ধ করে, সে দৈবাৎ ভুলে গেছে—"

গদাই কথাটা শেষ না করতেই হারু চমকে উঠে বলে, "এ-ই কিসের শব্দ রে?"

শুনে গদাইও থমকায়।

সত্যিই কিসের শব্দ? হুঁ হুঁ, চিঁ চিঁ!

মানুষের? না ভূত প্রেত পেত্নী শাঁকচুন্নীর? কান খাড়া ক'রে শুনতে লাগল ওরা!

নাঃ, মানুষের ব্যাপারই বটে।

অন্ধকার ঘুটঘুটে এই বাড়িখানার কোন্ কোণের দিকের একটা ঘর থেকে খুব রুগ্ন-মানুষের চিঁ চিঁ গলার আওয়াজ ভেসে আসছে, "কার পায়ের শব্দ রে? কেষ্ট এলি না কি? কেষ্ট! অ কেষ্ট! কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস? কখন থেকে একটু জল চাইছি।"

অন্ধকারে দু'জনে চুপচাপ!

খানিক পরে হারু বলে, "ব্যাপার বুঝতে পারছিস্? বাড়ির কোথাও কোনখানে একটা রুগী আছে, সেটাই 'জল জল' করে চিল্লাচিল্লি করছে।"

হারুর কথাই সত্যি।

সেই চিঁ চিঁ শব্দের মধ্যে থেকে শোনা যায়—"কেষ্ট অ কেষ্ট, গলাটা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, জল দে একটু।"

আশ্চয্যি 'কেষ্ট'-নামক কাউকেই কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। না সাড়া না শব্দ!

"বাড়িতে ওই রুগীটা ছাড়া আর কেউ নেই!" হারু বলে।

গদাই বলে, "ওই কেষ্টটাই তা'হলে কোথাও গেছে।"

"ছেলে বোধ হয় বুড়োর?"

"হ'তে পারে। কিন্তু মনে হচ্ছে মিথ্যে এলাম। এ বাড়িতে কি কিছু মিলবে?"

"আরে বাবা, এত বড় বাড়িতে বাসনপত্তরও কি কিছু নেই? চল না ওই

The New Edition of A. T. Dev's

STUDENT'S FAVOURITE DICTIONARY

(Eng. To Beng. & Eng.)

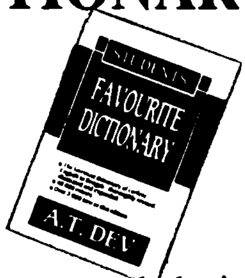

- The foremost dictionary of Current English to Bengali thoroughly revised, illustrated and expanded.
- New demy size.
- Over 40,000 entries in this edition.
- Up-to-date coverage of new words.
- Encyclopaedic appendices covering language and literature, mythological characters, biographies, quotations, world gazetteer, Greek and Russian alphabet, weights and measures, mathematical formulas, abbreviations.

Dev Sahitya Kutir (P) Ltd., 21, Jhamapukur Lane, Calcutta - 700 009

পাশের ঘরটায়।"

যে ঘর থেকে আওয়াজ আসছিল তার পাশের ঘরে ঢুকে খুব সন্তর্পণে একটা দেশলাই কাঠি জ্বাললো গদাই। না, ঘরে কেউ নেই। কিন্তু জিনিসপত্রই বা কই? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো সেল্‌ফ, একটা মস্ত লম্বা টেবিল, একটা মুখ-খোলা খালি কাঠের সিন্দুক সব খোলা হাঁ-হাঁ করছে। কোনখানে কিছু নেই।

"বাবা রে, যেন রূপকথার গল্পের মতন নিঝুমপুরী প'ড়ো বাড়ি!" বললো গদাই।

"চ পালাই! আর দরকার নেই বাবা!" হারু বলে।

"পালাবি? হেস্তনেস্ত একটা না দেখেই?"

ততক্ষণে সেই চিঁ চিঁ কণ্ঠ যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, "কে, কে, পাশের ঘরে কে কথা কইছে? কেষ্টা এলি? এলি তো আমার কাছে আয়।"

"নাঃ, বুড়োটা জ্বালালে!" বললো গদাই, "চেঁচামেচি শুনে কে কম্‌নে থেকে এসে পড়বে। গলাটা টিপে দিয়ে শেষ ক'রে ফেললেই আপদ চোকে!"

"কী আপদ!" হারু বলে, "কোথাও কিছু জুটবে কি না, তাই বুঝতে পারছি না, আর এ ছোঁড়া কিনা খুনের দায়ে ফাঁসি যেতে চায়। চল না দেখিগে ও ঘরে। রুগ্ন বুড়োটা একা আমাদের দু'জনের আর কি করবে?"

"তা' সত্যি, আর তেমন কিছু করে, গলা টিপে দেওয়া তো আছেই হাতে।" গম্ভীরভাবে বলে গদাই।

অতএব সাহসে ভর ক'রে দুই স্যাঙাৎ এ ঘরে ঢুকে এসে দাঁড়ায়।

ঘরে মিটমিট ক'রে একটি প্রদীপ জ্বলছে, চৌকির ওপর একটি জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ কি অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছে? নইলে এরা দোরের পাশে দাঁড়াতে ও বলে উঠল কেন, "কে? কে? ওখানে কে?"

বলা বাহুল্য—এরা চুপ!

এবার বৃদ্ধ হঠাৎ কেঁদে ওঠে, "কেন এমন করছিস কেষ্ট? কাকে এনেছিস? কার সঙ্গে কথা কইছিস? কানা অন্ধ মানুষের সঙ্গে কি তোর তামাসার সম্পর্ক? তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক গেলাস জল দে বাবা!"

কানা অন্ধ!

চমকে ওঠে হারু-গদাই!

একটা বিরাট দৈত্যের মত বাড়িতে শুধু একটা অন্ধ বুড়ো?

এমন তো কখনো দেখা যায় না!

কিন্তু! অন্ধ যখন, তখন আর ভয় কি? ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ওরা।

পায়ের শব্দে বুড়ো হঠাৎ আর একবার চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে, "ওরে হতভাগা কেষ্টা, তুই কি আমায় মেরে ফেলতে চাস? তবে দে, গলাটা টিপে একবারে শেষ করে দে। হা ভগবান! অন্ধ হয়েও যে কেন মানুষে বেঁচে থাকে।"

হারু এবার আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। বুড়োর কাছে গিয়ে বলে, "কেষ্ট কে?"

"কেষ্ট? কেষ্টই আমার সব! আমার অন্ধের নাড়ি।" বুড়ো ভদ্রলোক হতাশভাবে বলে, "সে আমার পুরনো চাকর! কিন্তু তোমরা কে? তোমরা কি কেষ্টর—কিন্তু যেই হও, আগে আমায় এক গ্লাস জল দাও বাবা।"

হারু ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে জলের কুঁজো রয়েছে একটা। জল ঢেলে বুড়োর কাছে এসে হাতে ধরিয়ে দেয়।

জল খেয়ে বুড়ো একটা 'আঃ' শব্দ ক'রে বলে ওঠে, "তোমরা কে? বল না গো? চোখে দেখতে পাইনে, কেষ্টা কোথায় চলে গেল বলে গেল না, আমি কি করব। সে যে আমার ছেলে বলতে ছেলে, নাতি বলতে নাতি। না বলে কয়ে কোথায় গেল!"

কেষ্টা যে কোথায় চলে গেছে এতক্ষণে আর বুঝতে বাকী নেই এদের। কারণ মিটমিটে আলো চোখে সইতে সইতে ঘরের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঘরের মধ্যে একটা দেরাজ, একটা আলমারি ও কয়েকটা বাক্স। সব খোলা হাঁ হাঁ করছে, ভিতরে একটুকরো মাত্রও জিনিস নেই।

গদাই চাপা গলায় বলে, "দেখছিস? দেখছিস কাণ্ড? শুনলি তো কেষ্টা না কি এনার পুরনো-চাকর! হা ভগবান! আমরা তিন-পুরুষে চোর তাও বোধহয় এমনটা পারতাম না!"

বৃদ্ধ উত্তেজিতভাবে বলে, "কি বলছ তোমরা চুপি চুপি?"

গদাই শান্তভাবে বলে, "কিছু না বাবু, বলছি কেষ্ট হঠাৎ দেশ থেকে চিঠি পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেছে, আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আপনার কাজ করতে।"

"আর ও কে? আর একজন? যার সঙ্গে কথা কইছ তুমি?" বৃদ্ধ সন্দেহ-সন্দেহ গলায় বলে।

গদাই তেমনি শান্তভাবে বলে, "ও আমার বন্ধু। ওর ইচ্ছে হয় এখানে থাকবে, ইচ্ছে হয় পুরনো কাজে ফিরে যাবে।"

বুড়ো ভদ্রলোক আন্দাজে হাতটা বাড়িয়ে গদাইয়ের গায়ে ঠেকিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, "তুমি আর কেষ্টর মতন চলে যাবে না তো?"

"না বাবু! মরবার আগে নয়।"

হতভম্ব হারু হঠাৎ গদাইয়ের হাতটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঘরের বাইরে এনে চাপা উত্তেজিতভাবে বলে, "এটা কি হল রে গদাই?"

চিরকেলে রোখা গদাই শান্তভাবে বলে, "কিছু না! চুরি আর করবো না ঠিক করলাম।"

"কারণ?"

"কারণ? কারণ কি জানিস হেরো, চিরদিন চুরির আগের অবস্থাটা দেখেছি, চুরির পরের অবস্থা কখনোও দেখিনি। দেখে বুঝছি, কী নোঙরা কী কুচ্ছিৎ কাণ্ডই না করে আসি আমরা।"

"তা' হলে এবার থেকে সৎপথে?"

"দেখি! রাগ করিসনে ভাই।"

"রাগ আবার কি?" হারু স্থিরভাবে বলে, "আমিই কি আর চুরির দিকে যাচ্ছি নাকি? অন্ধ বুড়োটাকে খাওয়াতে পরাতেও হবে তো? দু'জনে মিলে মোটটোট বয়ে যা'হোক ক'রে—"

জানা-অজানা ● প্রদীপ কুমার মিত্র

বিশ্বের বৃহত্তম প্রতীক্ষালয়

চীনের বেজিং-এর অন্তর্গত পিকিং স্টেশনের প্রতীক্ষালয়টি বিশ্বের বৃহত্তম প্রতীক্ষালয়। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এটির নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। বসে এবং দাঁড়িয়ে মোট চোদ্দ হাজার যাত্রী এই প্রতীক্ষালয়টিতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

যা গরম, ভালো থাকাই মুশকিল, তাই না! সাবধানে থাকবে কেমন। তবে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেই কলকাতা বা বাংলার গরমে আর কষ্ট নেই। ঝিরঝিরে হাওয়া সারাদিন রোদে পোড়া, ঘেমো গরমে নাস্তানাবুদ হওয়া মানুষের গায় যেন শীতল পরশ বুলিয়ে দেয়। তখন ভারী ভালো লাগে। গরম বলেই তো এখনকার মরশুমি সব ফল চটপট পেকে যায়। আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, ফলসা—আরও কত ফল। তরমুজ, ফুটি-টুটি তো আছেই। ওদিকে দিনটাও এখন আরও বড় হয়ে গেছে। চারটে বেজে ঊনষাট মিনিট দশ সেকেন্ডের মাথায় সূর্যদেব পুব আকাশে উঁকি দেন। অস্তে যান সন্ধ্যা ছটা ছ'মিনিট ছয় সেকেন্ডে। দেখলে তো দিনটা এখন কত বড়। এখন যদি কোনোদিন রাতের দিকে আকাশের জ্বলজ্বলে তারাদের দেখো তাহলে দেখতে পাবে তারারা কতটা উজ্জ্বল, কতটা ঝলমলে। তখন আকাশে কী দেখবে? আকাশের উত্তর-পূর্ব দিকে একটা নতুন তারাকে দেখতে পাবে। তার নাম অভিজিৎ। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তুলা রাশির সঙ্গে সঙ্গে বৃশ্চিক রাশিকেও দেখতে পাওয়া যায়। বৃশ্চিক রাশিই এ মাসের নতুন নক্ষত্রমণ্ডলী। তার মধ্যিখানে জ্বলজ্বল করছে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র। এই মাসের নামও ঐ নক্ষত্র থেকে। কালপুরুষ আর বৃষ রাশি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। অন্য সব তারা বৈশাখ মাসের মতো।

ওদিকে গাছে গাছে নানা ফুলের সমারোহ। এখন তো চাঁপার মরশুম। চাঁপা ফুল যেন আনন্দে মাথা নাড়ছে। কাঠচাঁপা, কনকচাঁপা, ভুঁইচাঁপা, কাঁঠালিচাঁপার গন্ধে চারদিক ম ম করে। কৃষ্ণচূড়া, গুলমোহর, বাঁদরলাঠি গাছের দিকে তাকালে মনে হয়, ফাগুন লেগেছে বনে বনে। কিন্তু গাছের রাঙা হাসি দেখতে না দেখতেই এসে যাবে বর্ষা। তার অবশ্য এখনো একটু দেরি আছে। আজকালকার আবহাওয়া যা খামখেয়ালি, কখন যে কী হবে কেউ জানে না। থাক ও সব কথা, এবার এসো তোমাদের চিঠির উত্তর দিই।

চৈতালী চক্রবর্তী (বাঁকড়া)

উত্তর : দাদুমণির ছবি তোমার কাছেই আছে। চোখ বুজে একটু ভাবো, দেখতে পাবে। আর অভিমান নেই তো? পুরো ঠিকানা দাওনি কেন?

প্রসেনজিৎ সামন্ত (৫৩/৩৫/১, বিদ্যায়তন সরণী, আলমবাজার, কলকাতা-৭০০ ০৩৫)

উত্তর : শুকতারার বন্ধুদের মন কেন খারাপ থাকবে? কেন তোমার মনে হবে, তুমি একা, তোমার পাশে কেউ নেই? কী আশ্চর্য! ভুলে গেলে, তোমার একজন দাদুমণি আছে, শুকতারার এত বন্ধু আছে! তাহলে? একদম মন খারাপ করবে না। মন খারাপ লাগলেই যে কোনো একটা শুকতারা (পুরোনো হলেও ক্ষতি নেই) নিয়ে পড়তে শুরু করবে। দেখবে মন ভালো হয়ে যাবে।

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রযত্নে—শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৪ বনমালী নস্কর রোড, বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৬০)

উত্তর : দেখো দেখি কাণ্ড! চিঠির উত্তর পেতে দেরি হলো বলে অত মন খারাপ করতে হয় নাকি? এখন নিশ্চয় খুশি। শুকতারার জন্যে গল্প, কবিতা তুমি তো পাঠাতেই পারো।

অনিন্দিতা বিশ্বাস [১২ বছর] (প্রযত্নে—অর্ধেন্দু বিশ্বাস, পোঃ ও গ্রাম-ট্যাংরা কলোনী, উঃ ২৪ পরগনা)

উত্তর : কী মুশকিল, দাদুমণির কাছে আবার গ্রামের মেয়ে, শহরের মেয়ে বলে আলাদা কিছু আছে নাকি! দাদুমণির কাছে সবাই সমান। শুকতারার বন্ধুদের সকলকেই সমান ভালোবাসে দাদুমণি। আর দুঃখ নেই তো! তুমি মোটেই একা নও। শুকতারার বন্ধুরা আছে না! দেখো, ওরা তোমায় ঠিক চিঠি দেবে। তুমিও তো দিতে পারো—তাই না।

সেখ মোহাঃ হাসানুজ্জামান (প্রযত্নে—সেখ আলাবত আলি, গ্রাম-কোটবাড়, পোঃ-আশুতিয়া, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১ ৬২৬)

উত্তর : তোমার চিঠিটা পড়ে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। একটা কথা মনে রেখো, আমিও তাই বিশ্বাস করি, মানুষের সব থেকে বড় বন্ধু হলো বই। যখনই তোমার একা লাগবে, মন খারাপ লাগবে, তখনই একটা ভালো বই নিয়ে পড়তে শুরু করবে। তা ছাড়া তোমার তো দাদুমণি আছে। আছে না? তাহলে? শুকতারার বন্ধুরাও তোমার পাশে আছে। তুমি স্টার পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছো বলে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমাদের সকলের অভিনন্দন নাও। মনে রেখো, তোমায় আরও ভালো রেজাল্ট করতে হবে।

ডোরা দে হাজরা (৩০, বাবুরাম ঘোষ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৫)

উত্তর : তোমার কবিতাটা খুব ভালো হয়েছে। আরও লেখো। যত লিখবে লেখা ততই ভালো হবে। চিঠির উত্তর তো পেলে। আর নিশ্চয়ই দাদুমণির সঙ্গে আড়ি করবে না। সেরা চিঠি সকলেই লিখতে পারে। কুপনেই নিয়ম ছাপা আছে। দেখে নিও কেমন।

শিবরাম রায় (প্রযত্নে—গৌরমোহন রায়, তেঁতুলতলা, জি. টি. রোড, জেলা-হুগলি, ৭১২ ১২৪)

উত্তর : কী কাণ্ড বল দেখি। হাইট কম বলে জাতীয় স্তরে খেলা সত্ত্বেও ভলির কোর্ট থেকে তোমায় সরে আসতে হলো। আমার খুব খারাপ লাগছে। কী আর করবে বলো। আমাদের সময়ও দোল নিয়ে খুব মজা হতো। রং খেলা তো হতোই, নগর-সংকীর্তনও বেরুতো। সেই সঙ্গে গরম গরম মালপোয়া খাওয়া হতো। সে তো এখনও হয়। তা ছাড়া নানা অনুষ্ঠান হতো।

উপমা চক্রবর্তী [ক্লাশ-ফোর] (৪৪/১, হিন্দ রোড, নিউ সন্তোষপুর, কলকাতা-৭৫)

উত্তর : দাদুমণি তো তোমাদেরই দাদুমণি। তাই না? তার আবার নাম কী! রাগ কোর না প্লিজ, আড়িও করে দিও না। তাহলে কিন্তু দাদুমণির খুব কষ্ট হবে। শারদীয়া সংখ্যা তোমার খুব ভালো লেগেছে জেনে আমরা সকলে খুব খুশি হয়েছি।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয়হিন্দ।

—তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

সব্যসাচী চন্দ্র, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, বহরমপুর জে. এন. একাডেমি, মুর্শিদাবাদ

আমাদের ছুটি নেই

আমাদের ছুটি নেই
খাটি বারোমাস,
আনন্দে মাঠে মাঠে
করে যাই চাষ।

বীজ পুঁতি, জল ঢালি
হাতে মাটি মাখি,
অঙ্কুর বের হবে
আনন্দে থাকি।

ফুল-ফলে ভরে মাঠ
সবুজের মেলা,
তা দেখে আশায় বুক
ভরে দুই বেলা।

গায়েতে ঝরিয়ে ঘাম
পায়ে মেখে মাটি,
মাটিকে যে মা ভাবি
একদম খাঁটি।

আলোক মহাপাত্র,
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী,
ভোগপুর কে. এম. হাই স্কুল,
মেদিনীপুর

ব্যাখ্যাতীত

আমি তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের বাড়ি থেকে ইস্কুল কিছুটা দূরে। তাই পাড়ার এক বন্ধুর সঙ্গে রোজ হেঁটে ইস্কুল যেতাম। যাওয়ার পথে দেখতাম এক বুড়ি গাছতলায় বসে পথচারীদের কাছ থেকে ভিক্ষে চাইছে। আমাদের কাছেও চাইত, কিন্তু যেহেতু আমাদের কাছে পয়সা থাকত না তাই তাকে কিছু দিতেও পারতাম না। সেবার বর্ষাকালে বন্ধু জ্বরে পড়ল। অগত্যা একাই আমি ইস্কুলে যাই। দু'দিন ধরে খুব দুর্যোগ চলছে। সারা দিনই বৃষ্টি। তার মধ্যেও আমার ইস্কুল যাবার কামাই নেই। এরই মধ্যে একদিন বুড়িকে দেব বলে দুটো টাকা সঙ্গে নিলাম। কিন্তু যাবার পথে তাকে দেখতে পেলাম না, ভাবলাম ফেরার পথে দেব। ইস্কুল ছুটি হতে বাড়ি ফিরছি। তখনও বৃষ্টি পড়ছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। রাস্তাঘাট নির্জন। হঠাৎ দূর থেকে দেখে মনে হলো গাছতলায় বুড়ি বসে আছে। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বললাম, দাঁড়াও, আজ আমি তোমায় টাকা দেব। বলে ব্যাগ সামলে টাকা বের করে দিতে গিয়ে দেখি বুড়ি নেই, শুধু ওর কম্বলটা জলে ভিজছে। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, ওমা! এই তো ছিল, এখুনি আবার কোথায় গেল বুড়ি! যাই হোক ভেজার ইচ্ছে ছিল না তাই একটু এগিয়ে একটা চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা, এখানে যে বুড়িটা বসে থাকত সে কোথায়? দোকানী বলল, কেন তুমি জান না? পরশু দিন ঝড়জলের মধ্যে গাছের মোটা ডাল ভেঙে মাথায় পড়ে ও তো মারা গেছে। আমি সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এলাম তবে বিদ্যুতের আলোয় গাছের তলায় আমি কাকে দেখেছিলাম? এর উত্তর আমি আজও পাইনি।

মিতুল চক্রবর্তী,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
চুঁচুড়া বালিকা বাণী মন্দির, হুগলী

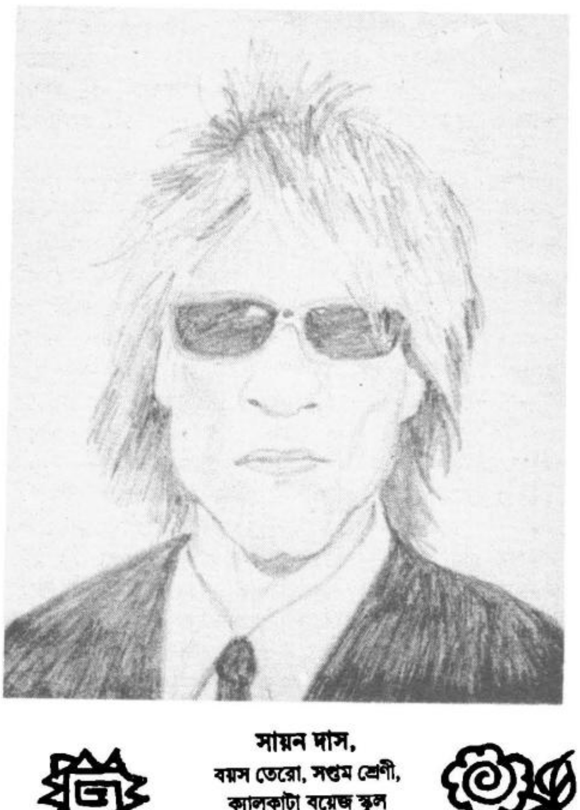

সায়ন দাস,
বয়স তেরো, সপ্তম শ্রেণী,
ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল

অনামিতা বাউল, বয়স সতেরো, একাদশ শ্রেণী, লামডিং, অসম

হায় মনুষ্যত্ব!

হায়! আজ এ কি দেখি? এ কি দেখি?
হাজার কাজের মাঝে, এ কি বিধাতার ফাঁকি?
নয় বিধাতার ফাঁকি, নয় ফাঁকি নিয়তির,
তুচ্ছ, ক্ষুদ্র ভেবে ফাঁকি দেয় সেই বীর।
জীবকুলে শ্রেষ্ঠ সে, নেই মান, নেই হুঁশ,
কেমনে বড়াই করে বলে সে, 'আমি মানুষ'?
ভালবাসা কোথা আজ? কোথা আজ শান্তি?
স্বস্তি লুপ্ত, শুধু হতাশা ও ক্লান্তি।
দ্বন্দ্বে, বিবাদে ধরা কলুষিত, বিষময়,
বিবেকবিহীন যারা, বোঝে না যে এ কী ক্ষয়।
স্বার্থসিদ্ধি যার জীবনের লক্ষ্য;
নির্মমতার শুধু যারা নেয় পক্ষ;
ধ্বংসের দাবানলে মহী করে দগ্ধ,
হিংসা-দ্বেষের বাণে শিহরিত, স্তব্ধ।
অবোধ যন্ত্র তারা জানে না যে একি পাপ,
জানে না পাপের ফল কভু হবে নাকো মাফ।
কেন নাথ? কেন তুমি দিলে গো এমন লাজ?
মনুষ্যত্ববিহীন—এ কঠিন জগৎ আজ?!

দীধিতি মুখার্জী,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
হোলি চাইল্ড গার্লস হাই স্কুল, কলকাতা

পূজারিণী

বালিকা পূজারিণী রোজ ভোরবেলা হলে
ফুল-সাজি হাতে নিয়ে মন্দিরে হেঁটে চলে।

লালপেড়ে শাড়ি পরে হাঁটে সে অনেক পথ
মনে আশা, পূজা করে পূর্ণ হবে মনোরথ।

বালিকা পূজায় বসে, ভক্তিভরে পাঠ করে
মন্ত্রের প্রতিধ্বনি জাগায় নীরব জগদীশ্বরে।

সঞ্চয়িতা মৈত্র,
বয়স সতেরো, একাদশ শ্রেণী,
হাওড়া অক্ষয় শিক্ষায়তন

শুভজিৎ চক্রবর্তী, বয়স এগারো, পঞ্চম শ্রেণী,
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন, বর্ধমান

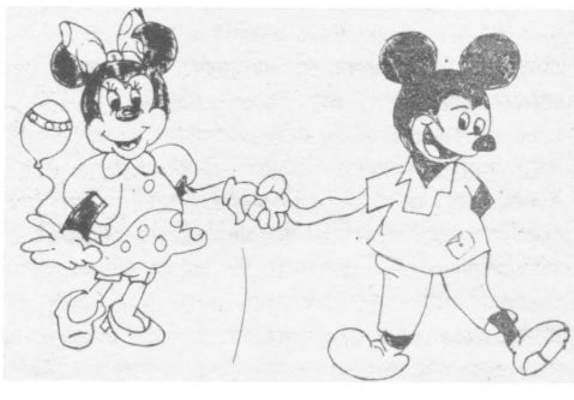

দেবযানী রায়, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির, দুর্গাপুর, বর্ধমান

বিষয়—সমাজ ও সাহিত্য : নারায়ণদাস বাঙ্গুর মেমোরিয়াল মালটিপারপাস স্কুল

আমরা বলছি

[বিদ্যালয়-পরিচিতি—বিদ্যালয়ের নাম 'নারায়ণদাস বাঙ্গুর মেমোরিয়াল মালটিপারপাস স্কুল' (গভঃ স্পনসর্ড) হলেও এটি বাঙ্গুর গভঃ স্পনসর্ড বলেই অধিক পরিচিত। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। বিদ্যালয়ের খোলামেলা পরিবেশ, বিদ্যালয় সংলগ্ন বিশাল খেলার মাঠ বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমৃদ্ধ করেছে। অল্প দিনেই এই বিদ্যালয় সুখ্যাতি অর্জন করেছে। মৃণালকান্তি মহাপাত্র]

প্রথম

সাহিত্য কেমন হবে তা নিয়ে লেখক ও সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে সবাই একথা মেনে নিয়েছেন যে সাহিত্য হবে সমাজের দর্পণ। ইংরেজিতে বলা যায় যে, Literature will be the mirror of society.

সমস্ত ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই একথা সত্য যে সমাজ ও সাহিত্য পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাকে সমাজেই বাস করতে হয়। সুতরাং সাহিত্য কখনও সমাজের প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। ইংরেজি, জার্মান, ফরাসী, বাংলা—সব সাহিত্যেই সমাজের তীব্র প্রভাব আমরা দেখতে পাই।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে বাংলা সাহিত্যে ইংরেজের অত্যাচার ও শোষণের কাহিনী খুবই স্পষ্ট। সেই সময়ের সাহিত্যে জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেম সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়। বিদ্যাসাগরের সমকালে ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সময় সাহিত্যে নারী স্বাধীনতা, কুসংস্কার দূরীকরণ প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সামাজিক কুপ্রথাগুলিকে একেবারে স্পষ্ট করে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সমাজের বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর নিজের কথাতেই—তাঁর সাহিত্যের নব্বই শতাংশ চরিত্র ও ঘটনা তাঁর নিজের চোখে দেখা।

ইউরোপে নবজাগরণের সময় নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হয়। শেক্সপীয়র, চসার, বেকন—এঁরা সবাই তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে নবজাগরণের নতুন দিগন্ত তুলে ধরেন। বেকন তাঁর লেখা Henry the Eight এবং অন্যান্য প্রবন্ধে রাজনীতি ও ইতিহাসকে একসঙ্গে গ্রথিত করেন। শেক্সপীয়রের প্রায় সব ট্রাজেডি ও কমেডিগুলি তো একেবারে সমাজের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। চসার-এর The Canterbury Tales এবং The Nun Priest's Tale-এ সমাজের ধনী, দরিদ্র সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সমাজচিত্র, রীতিনীতি ও জীবনযাপনের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। ফরাসী লেখক মোঁপাসা তাঁর অধিকাংশ ছোট গল্পে তৎকালীন সমাজের বিশ্লেষণাত্মক চিত্র অঙ্কন করেছেন। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের প্রতি বিদ্রূপ ও সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। তাঁর লেখা The Necklace গল্পটি এই বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ইংল্যান্ডের যুদ্ধের সময়ের কবিতা দেখলে তাতে যুদ্ধের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রুশোর লেখায় মানুষের মনে বিপ্লবী চেতনা জাগে। যেমন আমাদের নজরুল ও সুকান্তের কবিতা বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টি করে। হ্যারিয়েট স্টৌ-র Uncle Tom's Cabin গ্রন্থে নিগ্রোদের উপর শ্বেতাঙ্গ দাস মালিকদের অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে নিগ্রোদের মধ্যে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটে।

আধুনিক সাহিত্যের যুগ হলো কল্পবিজ্ঞানের যুগ। সুতরাং বিজ্ঞান ও সমাজকে ঘিরে অনেক সাহিত্যের সৃষ্টি হচ্ছে। সেখানে কল্পবিজ্ঞান মূল বিষয় হলেও সমাজের প্রভাব আছে। কারণ এসব সাহিত্যের উদ্দেশ্যে হলো মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা জাগানো এবং সমাজের মধ্যে শিক্ষার অগ্রগতি ঘটানো। উদাহরণ হিসেবে স্পাইডারম্যান, হি-ম্যান, টিনটিন, স্টার ওয়ার্স প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

সমাজের পরিবর্তন অনবরত ঘটে চলেছে, সেই জন্য সাহিত্যেরও পরিবর্তন স্বাভাবিক। সাহিত্য সমসাময়িক সমাজের চিত্ররূপ—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তনুজ্যোতি তেওয়ারি
নবম শ্রেণী

দ্বিতীয়

সাহিত্য সমাজের দর্পণ, সমাজে যা কিছু ঘটে তারই প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে। লেখক তুলে ধরেন সাধারণ মানুষের আনন্দ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, ব্যথা-বেদনা এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনী। সাহিত্যের ওপর সমাজের প্রভাব যেমন, তেমনি সমাজের উপরও সাহিত্যের প্রভাব থাকে। এক কথায় সমাজ ও সাহিত্য যেন একে অপরের পরিপূরক।

মানুষের ইতিহাস বা তার ক্রম বিবর্তনের ধারাকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা যেমন মানব ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করি তেমনিভাবে সাহিত্যের কালনির্দেশ ঠিকভাবে করার জন্য সাহিত্যকেও আমরা তিন ভাগে ভাগ করে থাকি। যথা—(ক) প্রাচীন সাহিত্য (খ) মধ্যযুগীয় সাহিত্য এবং (গ) আধুনিক সাহিত্য।

(ক) *প্রাচীন সাহিত্য :* প্রাচীন সাহিত্য দ্বারা আমরা প্রাচীন সমাজের সঙ্গে পরিচিত হই। প্রাচীন সাহিত্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(i) *ধর্মীয় সাহিত্য :*—আর্যদের পূজা-পার্বণ, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মীয় আচার-আচরণ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন আমাদের নিকট অজানা থাকত যদি না আমরা বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র পাঠ না করতাম। তাই আর্যদের ইতিহাস জানার জন্য এই সমস্ত ধর্মশাস্ত্র বহুলাংশে আমাদের সহায়ক। তখনকার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, আন্তঃগোষ্ঠিক সম্পর্ক, উৎসব, অনুষ্ঠান প্রভৃতির একটা বিশ্বস্ত প্রতিফলন মেলে সেই সময়কার সাহিত্যে। (ii) *ঐতিহাসিক সাহিত্য :*—খ্রিঃ পূঃ তৃতীয়

শতাব্দী ও তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সাহিত্য রচিত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাণভট্টের হর্ষচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতমানস প্রভৃতি। এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে প্রাচীন রাজবংশগুলির ইতিহাস জানা যায়। ঐতিহাসিক পালাবদলে কিভাবে সমাজের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে, তারও একটা কালানুক্রমিক ও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলগত পরিচয় পাওয়া যায়।

(খ) *মধ্যযুগীয় সাহিত্য :* মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিম সাহিত্য উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস রচনায় মুসলমানদের কৃতিত্ব অপরিমেয়। আরবদের ভারত অভিযানের সময় থেকে মুসলিম ইতিহাসবিদদের ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থ লেখা শুরু হয়। আরবী ভাষায় রচিত চাচনামা থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয়, ওমীর মহম্মদ মাসুম রচিত তারিখ-ই-সিন্ধ থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয় থেকে আকবরের রাজত্বকালের ঘটনা জানা যায়। এছাড়া এই যুগের বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী, চর্যাপদ, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত গ্রন্থে মূলত দেবমাহাত্ম্যই কীর্তিত হয়েছে। তাই বলা যায় মধ্যযুগীয় বঙ্গ সাহিত্য মূলত ধর্মীয় বিশ্বাস বা আচার-অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক। তবে তারই মধ্যে মধ্যযুগের মুসলমান বাঙালী কবিরা কেউ কেউ নিজেদের কাব্যে রক্ত-মাংসের মানুষের হাসি-কান্নাই বাস্তবানুগত্য ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিফলিত করেছেন।

(গ) *আধুনিক সাহিত্য :* বর্তমান আধুনিক সাহিত্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিকে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে এবং এর জনপ্রিয়তা দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে। সহজ, সরল ও বোধগম্য ভাষার দ্বারা পরিপূর্ণ আধুনিক গ্রন্থগুলি পাঠকদের পড়ার ইচ্ছাকে তাই দিন দিন বহুগুণে বাড়িয়ে চলেছে। বর্তমান সাহিত্যের মূল লক্ষ্য হলো সমাজকে ঘিরে, সমাজকে নিয়ে, মানব জীবনের আনন্দ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, ব্যথা-বেদনা এবং তার মনের কথা তুলে ধরা। আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়, যথা—উপন্যাস, ছোট গল্প এবং কবিতা প্রত্যেকটিরই মূল কথা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই আধুনিক সাহিত্য মানবকেন্দ্রিক।

উপসংহার—সাহিত্য একযুগের সঙ্গে অন্য যুগের মিলনসেতু। আমরা যদি ইংরেজি বা জার্মান বা ফরাসী সাহিত্য পড়ি তবে আমরা সেই দেশের মানুষের ভাবনা-চিন্তা, সমাজব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারব। সাহিত্য সমাজের সঙ্গে সমাজের তথা একজনের ভাবনার সঙ্গে অন্যজনের ভাবনার মিলনসূত্র। সাহিত্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষে মানুষে সমন্বয়, মানুষের মনে শুভবোধের জাগরণ।

সায়ন দাস
নবম শ্রেণী

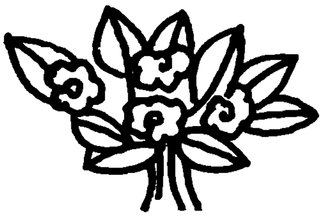

প্রকাশিত হল

অরূপরতন ভট্টাচার্য সম্পাদিত

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার একটি প্রামাণ্য বই

বিজ্ঞান যখন ভাবায় ২৬৫

পরিমার্জিত চারটি নতুন অধ্যায় সম্বলিত সংশোধিত সংস্করণ

লুচি কেন ফোলে? রক্তের রঙ লাল কেন? লাল মরিচ লাল কেন? তেঁতুল কেন বেশী টক? নারকেলের তিনটি মাত্র চোখ কেন? উল্কার কি নিজস্ব আলো আছে? গাছের পাতা ঝরে পড়ে কেন? ছাতার রং কালো কিন্তু ট্রাফিক পুলিশের ছাতার রঙ সাদা কেন?

এই ধরণের অনেক প্রশ্ন আর কৌতূহলের খোরাক আছে এই বই-এর পাতায় পাতায়। অনেক ছবিতে সমৃদ্ধ বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি এক ঐতিহাসিক প্রকাশন ।

❋ ❋ ❋

অরূপরতন ভট্টাচার্য্য ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

স্বাস্থ্য যখন ভাবায় ১০০

খেতে বসে কথা বলা কি খারাপ? হোমিওপ্যাথি ও অ্যালাপ্যাথি ওষুধ কি এক সঙ্গে খাওয়া চলবে? কানে পোকা ঢুকলে কি করবো? বাড়িতে মানিপ্ল্যাণ্ট থাকলে কি ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়ে? কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া কি দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর? নিম দাঁতন না টুথব্রাশ কোনটা বেশী উপকারী? চোখে গগলস সারাক্ষণ ব্যবহার করা কি চোখের পক্ষে ক্ষতিকর? দেশী ডিম বা পোলট্রি ডিম কোনটা বেশী উপকারী? একটি নবজাত শিশু বধির কিনা তা কি করে জানা যায়? চুলে মেহেন্দি লাগানো কি উচিৎ।

চিকিৎসা শাস্ত্রের কৌতূহলকর এই ধরণের হাজারো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এই বইটিতে যাতে কেটে যাবে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস, সংশয় ও অবৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা।

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা.) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩

হাঁদা-ভোঁদার
লেখা প্রতিযোগিতা
শোনো, আগামী কাল আমরা একটা হাতের লেখার প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি, আর তোমরা সবাই তাতে অংশগ্রহণ করবে। প্রধানশিক্ষক মহাশয় বিচার করবেন।
আমি তোর এটা ধার নিচ্ছি, ভোঁদা!
অ্যাই, হচ্ছেটা কি, হাঁদা!
আমি আগেই তোর খাতায় একটু প্র্যাকটিশ করছি রে, ভোঁদা! হেঃ হেঃ!
আরে, না-না! কালি দিয়ে নয়!
মাস্টারমশাই একটা উজবুক
ঠিক আছে, আমি পেনসিলই ব্যবহার করবো। তবে আগে ওটা ছুঁচোলো করে নিতে হবে।
হতভাগা, বেল্লিক কোথাকার!
হ্যাঁ, এবার পেনসিল যথেষ্ট ছুঁচোলো হয়েছে!
আরফ্!
গরর্! তুই খুবই মস্তানী করছিস, হাঁদা!
মরেচে! হেডস্যার আসছেন!
আমি কি ক্লাশঘরে বসে আমার লেখা প্র্যাকটিশ করতে পারি, স্যার?
অবশ্যই পারো ভোঁদা।

হাত মেলা, ভোঁদা। শেষপর্যন্ত তুই-ই তো জিতবি।
অ্যাঃ? ইয়ে-ঠিক আছে, হাঁদা!
আ-আর্ফ্! আমার হাত!
হেঃ হেঃ! মনে হচ্ছে এবার তোর লেখা তুই আর স্বচ্ছন্দে লিখতে পারবি না, ভোঁদা!
তুইও আর স্বচ্ছন্দে লিখতে পারবি না, হাঁদা!
ওরফ্!
দড়াম!
ওরে হাতটা গেলো রে!
রাস্তাটা কিন্তু তুই-ই দেখিয়েছিস, হাঁদা!
খুব ভালো হয়েছে, ভোঁদা। চমৎকার! তুই জিতেছিস!
ধন্যবাদ, স্যার!
এই হিজিবিজি কিসের? কে লিখেছে?
হাঁদা, স্যার!
হিঃ হিঃ! এবার হাঁদাকে পা দিয়ে একশো লাইন লিখতে হবে!
আমি অবশ্যই সঠিকভাবে লিখতে শিখবো

গল্প হলেও সত্যি

তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গাড়াগেবাবা—দেবুজী

মহারাষ্ট্রের শেনগাঁও-এর ছেলে দেবুজী। আট বছর বয়সে দেবুজীর বাবা মারা যায়। বসতবাটী মহাজনদের কাছে বাঁধা দিয়ে দেবুজীর মা তাকে সঙ্গে নিয়ে মামার বাড়িতে ওঠে। দেবুজীর মামার ছিল অনেক জমি, অনেক গরু। মামাবাড়িতে দেবুজীর কাজ পড়ল গরু চরানো। তার মা মামাবাড়ির সব কাজকর্ম করত। পড়াশোনা তার আর হলো না। গরু চরাতে চরাতে সে গরু, ভেড়া, মাঠের পশুপাখি সবাইকে ভালবেসে ফেলল। যেহেতু সে রাখাল ছিল, তাই গ্রামের চাষাভুষোদের সঙ্গে তার অবাধ মেলামেশা ছিল। সেই সুযোগে সে দেখেছিল তাদের হরেক কুসংস্কার, তাদের দুঃখ, তাদের অশিক্ষা। তার মামার ছেলেরা পড়াশোনা শিখত, সে আড়াল থেকে সেই সব জিনিস শুনে মনে রাখার চেষ্টা করত।

দেবুজী যখন পনের বছরের তখন তার মামা তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। দেবুজী দেখল বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়নের জন্য এসেছে ঝুড়ি-ঝুড়ি মদ আর মাংস। দেবুজীর গা ঘিনঘিন করে উঠল। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হলো। কিছুদিন ঘরে থেকে এক রাত্রে কাউকে না জানিয়ে দেবুজী সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে সে এক সাধুর আখড়ায় হাজির হলো। তার মনের সব দুঃখ সে ব্যক্ত করল সাধুর কাছে। সাধু তাকে শান্ত করে দেশ পরিভ্রমণের উপদেশ দিল। কেবল কৌপীন সম্বল করে হাতে বাঁশের লাঠি আর মাটির ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দেবুজী বেরিয়ে পড়ল। এক গ্রাম ঘুরে আর এক গ্রামে হাজির হয় সে। লোকের কাছে চেয়ে পাওয়া রঙিন কাপড়ের টুকরো দিয়ে আলখাল্লা বানিয়ে শীত কাটায় সে। দিনের ভিক্ষায় মাটির পাত্রে যা জমে তা-ই বিলিয়ে দেয় অন্ধ-খঞ্জদের। দেবুজী এই পরিক্রমা কালে নানা কাহিনী, নীতিমালা, তুকারামের গান, উপদেশ সবই কণ্ঠস্থ করে নিয়েছিল। হাটেবাজারে, তীর্থে যেখানেই লোক সমাগম হতো, দেবুজী সেখানে গিয়ে বলত, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়; তাঁরই সৃষ্ট এই জীবজগৎ। জগতের পশুপাখি সবই তাঁর। তাদের প্রতি ভালবাসা থাকলে তবেই ঈশ্বরের ভালবাসা লাভ করা যাবে।

প্রথম প্রথম লোকে তার কথায় আমল দিত না। একদিন এক জায়গায় জাতিভেদ নিয়ে দাঙ্গা চলছে। দেবুজী সেই দাঙ্গার মাঝে গিয়ে দাঁড়াল। লাঠির আঘাতে দেবুজীর মাথা ফেটে দেহ রক্তাক্ত হলো। যারা দাঙ্গা করছিল হঠাৎ তাদের সম্বিৎ ফিরল। তারা দেখল নাঙ্গা সাধুকে রক্তাক্ত করে তারা পাপ করেছে। তখন উভয় দলই দেবুজীর সেবা-শুশ্রূষায় মন দিল। দেবুজী সুস্থ হলো এবং সে গাঁয়ের দাঙ্গা বন্ধ করল। তারপর চলল অন্য গ্রামে।

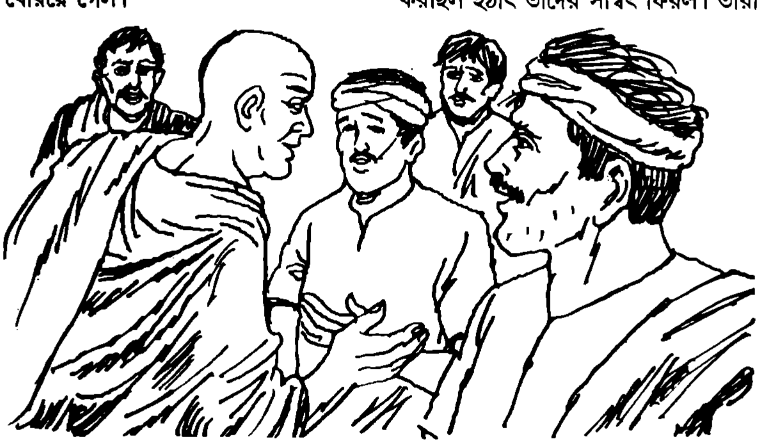

একদিন এক ঝড়ের মুহূর্তে এক সঙ্গীকে নিয়ে দেবুজী আশ্রয় নিয়েছিল এক পোড়ো মন্দিরে। মন্দিরের বিগ্রহের গায়ে একটি কুকুর প্রস্রাব করছিল দেখে তার সঙ্গী সেই কুকুরটাকে একটি ঢিল মারল। দেবুজী তা দেখে সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করল, ঐ দেবমূর্তি করেছে কে? সঙ্গীটি বলে, মানুষ। দেবুজী বলে, মানুষ কার সৃষ্টি? সঙ্গী উত্তর দেয়, ভগবানের সৃষ্টি। দেবুজী শেষে বলে, মানুষ তাহলে দেবমূর্তি নির্মাণের স্পর্ধা পায় কি করে? সঙ্গীটির জ্ঞান ফিরল।

মহারাষ্ট্রের লোকেরা মাটির পাত্রকে বলে গাড়াগে। সেই কারণে দেবুজী পরবর্তীকালে পরিচিত হয়েছিল গাড়াগেবাবা নামে। সারা জীবন ভবঘুরে হয়ে যে অর্থ জমিয়েছিল তা দিয়ে নানা জায়গায় গড়ে তুলেছিল সরাইখানা, জলসত্র, গরীবদের বিনাব্যয়ে থাকার ঘর, রুগ্ন পশুদের খোঁয়াড় আর বৃদ্ধদের আবাস।

একবার এক জনসভায় গাড়াগেবাবা যখন ধর্মপ্রচার করছে, একজন তার কানে কানে তার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ জানাল। গাড়াগেবাবা স্থিরচিত্তে আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগল। পরে এই শোকবার্তাকে কেন্দ্র করে নতুন আলোচনা শুরু করল। তুকারামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে লাগল, কোটি কোটি জীব মৃত্যুমুখে পড়ছে, তার মধ্যে একজনের মৃত্যুতে আমি কাঁদব কেন? গাড়াগেবাবার স্থির ও শান্ত অবয়বের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শ্রোতারা।

তথ্যসূত্র জাতীয় চরিতাভিধান (২য় খণ্ড), পৃঃ ২০৯-১০

সুশীল কুমার সরকার স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

একতার জয়

কৃষ্ণদাস চ্যাটার্জী

শীর্ণ শ্যামলী নদী। তার পাড়ে দুটি গ্রাম—রামপুর ও লক্ষ্মণপুর। নদীর উপর নতুন বাঁধ তৈরি হয়েছে। ফলে বর্ষার ধরে রাখা জলে প্রখর গ্রীষ্মেতেও গ্রাম দুটি শস্য-শ্যামলা রূপ ধারণ করে আছে। কী একটা কারণে দুই গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ। শুধু একজন ডাক্তার দুই গ্রামকে এক করার চেষ্টা করেন অবিরত। হঠাৎ একদিন গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে একটি ঘোষণা দেখা গেল।

'বর্ষার জল বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য পরশু সকাল সাতটায় জল ছাড়তে হবে। এর ফলে রামপুর, লক্ষ্মণপুর ও তৎসহ গ্রামগুলি ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। গ্রামবাসীদের অবিলম্বে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কাঁশি বাঁধ কর্তৃপক্ষ।'

খবরটা পাবার পরেই দেখা যায় ডাক্তারবাবুর বাড়িতে জড়ো হয়েছে রামপুর গ্রামের চাষীরা। একজন বলে, 'অনেক কষ্ট করে ধান কটা ফলিয়েছি গো। ডাক্তারবাবু আপনি কিছু করুন। নইলে সব ভেসে যাবে।' সমস্বরে সবাই এক কথা বলে ওঠে। মুখ গম্ভীর করে ডাক্তার বলেন, 'আচ্ছা কাল সকালে যাব কর্তৃপক্ষের কাছে। সবাই যাবে তো?' সকলে একবাক্যে সম্মতি প্রকাশ করে।

'স্যার একটু বুঝবার চেষ্টা করুন। এরা অনেক আশা নিয়ে এসেছে,' বলেন ডাক্তার। মাথা নাড়িয়ে বলে ওঠেন বাঁধ কর্তৃপক্ষের প্রধান, 'সবই বুঝতে পারছি ডাক্তারবাবু। আর আপনি স্বয়ং নিজে এসেছেন। কিন্তু আমারও তো হাত-পা বাঁধা। জল ছাড়তেই হবে। কোনো সাহায্য করতে পারলাম না বলে ক্ষমা করবেন।'

অফিস থেকে ফিরেই কাঁদতে শুরু করেছে পরান। সে রামপুর গ্রামেরই একজন গরীব চাষী। সে বলতে থাকে, 'ধার-দেনা করে ফসল ফলিয়েছি, মাত্র এক রাতে তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।' ডাক্তারের মুখ ভার। হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। উঠোনে জমায়েত চাষীদের উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, 'আমার চাষী ভাইরা, উপায় একটা আছে। আমাদের নদীর পাড় ধরে মাটির বাঁধ দিতে হবে এবং তা এই রাতের মধ্যেই শেষ করতে হবে। জানি অসম্ভব, তবুও হারবো না আমরা। বলো, তোমরা রাজী?' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা সবাই রাজী আছি,' বলে ওঠে চাষীরা। হাসিমুখে ডাক্তার

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

দেব সাহিত্য কুটীরের সব রকম বই-এর প্রাপ্তিস্থান ঃ

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

দেব লাইব্রেরী
১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

চক্রবর্তী চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

বিংশ শতাব্দী
৭৫ সি, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

সিগ্যাল বুক সেন্টার
৩১, এস পি মুখার্জী রোড, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০ ০২৫

আই এস পি কে
৫১, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১

Suk—May-5

বললেন, 'তবে নিয়ে এস ঝুড়ি ও কোদাল। আলোর ব্যবস্থাও করতে হবে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি সবাই নদীর ধারে জড়ো হও।' চলে গেল চাষীরা। ডাক্তারের কথা তাদের মনে ক্ষীণ একটা আশার আলো জাগিয়েছে।

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ে চলেছে। সেই বৃষ্টি মাথায় করে বাঁধ নির্মাণ চলছে। কয়েকশো চাষী মাটি কেটে কেটে ফেলছে নদীর ধার বরাবর। ডাক্তার তদারকি করছেন। গ্রামের মেয়ে-বউরা হ্যারিকেন ছাতার তলায় ধরে আলো দেখাচ্ছে। হঠাৎ পরান ছুটতে ছুটতে এসে বলে, 'ডাক্তারবাবু, লক্ষ্মণপুর গ্রামের কবীর এসেছে। সঙ্গে অনেক লোক। বলেন তো লাশ ফেলে দি। আমাদের হাতে তো——,' বাধা দেন ডাক্তার। বলেন, 'আমাকে কথা বলতে দাও।' ডাক্তারবাবু এগিয়ে যান লক্ষ্মণপুরের লোকগুলোর দিকে। তারপর কবীরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বল কবীর, কী বলতে চাও তুমি।' কবীর বলে, 'ডাক্তারবাবু, বাঁধ না তৈরি হলে আমাদের গ্রামও ডুবে যাবে। তাই ভেদাভেদ ভুলে আপনাদের সঙ্গে আমরা কাজ করতে চাই।' ডাক্তার হাসিমুখে বললেন, 'বেশ তো, এ তো ভাল কথা।' কাজ করতে শুরু করে লক্ষ্মণপুর গ্রামের চাষীরাও। আসন্ন বিপদের ভয় ভুলিয়ে দেয় দুটি গ্রামের মধ্যে বহু পুরনো দলাদলি।

হাজার খানেক লোক কাজ করলেও রাত ক্রমশ্যই ফুরিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু, বাঁধ তৈরি এখনও অনেক বাকি। হঠাৎ মাটিতে বসে পড়েন ডাক্তার। ছুটে আসে সবাই। পরান জিজ্ঞাসা করে, 'কী হয়েছে ডাক্তারবাবু, আপনি কাঁদছেন?' দু'হাতে মুখ ঢেকে ডাক্তার বলেন, 'আমি পারলাম না রে পরান। পারলাম না তোদের গ্রাম, তোদের ফসল বাঁচাতে।' কবীর বলে, 'আমরা তো প্রাণ দিয়ে কাজ করছি? বাঁধ আমরা তৈরি করবই।' মাথা নাড়েন ডাক্তার, 'সময়টা জান? জল ছাড়া হবে সকাল সাতটায়, এখন বাজে দুটো। প্রাণ দিয়ে কাজ করলেও অসম্ভব।'

এমন সময় একজন চাষী ছুটে আসে। চোখে-মুখে তার খুশির চিহ্ন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে হাসতে হাসতে বলে, 'ডাক্তারবাবু, বাঁধ তৈরির খবর পেয়ে আশপাশের দশটি গ্রামের লোক আসছে আমাদের সাহায্য করতে।' চমকে উঠে ডাক্তার দূরে দেখেন, শত শত হ্যারিকেনের আলো বিরাট মালার আকার ধারণ করেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কত লোক হবে রে?' চাষীটি বলে, 'তা প্রায় পাঁচ হাজার।' ডাক্তার বলেন, 'কে বলে ভগবান নেই? ভগবান যে দুর্গতদের রক্ষা করেন, এটাই তার প্রমাণ।'

ক্রমাগত মাটি পড়ছে বাঁধের উপর। ছয় হাজার লোক প্রাণ-পণ কাজ করে চলেছে। দেখতে দেখতে সারা হয়ে যায় বিরাট বাঁধ। এইবার শেষ প্রশ্ন, জলের ধাক্কা সইতে পারবে তো বাঁধ? ঘড়ির দিকে তাকান ডাক্তার। সাতটা বেজে দশ। এইবার আসল সময়। ছয় হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চুপ হয়ে। সকলের মুখ বাঁধের দিকে। চোখ পলকহীন। যেন পাথরের মূর্তি। হঠাৎ শোনা গেল প্রবল জলোচ্ছ্বাসের শব্দ। বাঁধ যেন এখনই ভেঙে পড়বে। কিছু কিছু জায়গা থেকে জল পড়তে থাকে। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই বন্ধ হয়ে আসে তা। চিৎকার করে ওঠে চাষীরা, 'আমরা পেরেছি, আমরা পেরেছি আমাদের গ্রাম বাঁচাতে।' আনন্দের বন্যা বয়ে যায় চাষীদের মধ্যে। ডাক্তারের চোখ আনন্দ অশ্রুতে ভরে ওঠে। পরান আর কবীর এগিয়ে এসে প্রণাম করে ডাক্তারকে, বলে, 'আপনার জন্যই সব হয়েছে ডাক্তারবাবু।' ডাক্তার বুকে জড়িয়ে ধরেন দুজনকে। বলেন, 'না রে না। তোদের সকলের প্রাণপণ প্রচেষ্টাই গ্রামকে বাঁচিয়েছে। তোরা সবাই মিলে সাফল্য এনেছিস। আমি আর কী করেছি?'

জানো কী!

❑ খুড়োর সাহায্যে ভাড়াটে তাড়াবার ফন্দিটা ভালোই ফেঁদেছিল গজপতি। কিন্তু আঠারো নম্বরের ভাড়াটে আসার পরই সব গোলমাল। নতুন ভাড়াটের মেয়েকে একদিন গান গাইতে দেখে.........

❑ পুরোনো অ্যালবাম দেখতে দেখতে মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, মা দেখো, দেখো, সেই বুড়িমার ছবি। বোমা পড়ার সময় সেদিন উনিই তো আমাদের শেলটারে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। হাতের কাজ ফেলে ছুটে এলেন মা। ছবিটা দেখেই তাঁর মাথা ঘুরে গেল.............

❑ মনে হলো ভয় পেয়ে ভদ্রলোক উঠে গেলেন। এখানে আবার ভয় কাকে! শতদল চারপাশে তাকায়। অন্ধকার নামলেও কেমন যেন একটা রহস্যময় আলোর আভাস.......সেই আলোয় দেখা গেল...,........

❑ পাড়ার ক্লাবের সেক্রেটারি উজ্জ্বল হাজরার ভীষণ রাগ নবগোপালবাবুর ওপর। পাড়ার পুজো বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে একটা পয়সাও ঠেকান না তিনি। দুজনের মধ্যে শুরু হয় অঘোষিত যুদ্ধ। হাড়কেপ্পন মানুষটির সঙ্গে লড়ার জন্যে উজ্জ্বল বেছে নেয় নবগোপালবাবুরই ফুলের বাগান............তারপর..........

এই সব কৌতূহলের নিরসন হবে **শুকতারার** আষাঢ় সংখ্যায়। সঙ্গে আরও অনেক গল্প এবং এমন অনেক কিছু যা সবাইকে শিহরিত করবে, রোমাঞ্চিত করবে। চমকেও দেবে।

দিগন্তে তখন উদিয়মান সূর্য চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে সোনালি আলো যেন বলতে চাইছে সকলের মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টা কখনও বিফল হয় না।

সুশীল কুমার সরকার স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

সুফল

বিকাশ রায়

সুফলের গলায় সোনার মেডেল। প্রধান অতিথি যখন চর্তুদশ বর্ষীয় কিশোরের গলায় পদকটি ঝুলিয়ে দিলেন তখন চারদিক থেকে করতালি। গ্রামের গর্ব সুফল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মঞ্চ থেকে নেমে এল সুফল। মেডেলটা ছুঁয়ে ভাবছে স্বপ্ন নয় তো! সত্যি কথা কি শুধু সুফল কেন, কী প্রতিবেশী কী স্কুলের শিক্ষক কারও কল্পনাতেও ছিল না এ সাফল্যের ছবি।

সুফল অংকে ত্রিশ পাওয়া ছাত্র। মায়ের আফশোস কোনোদিন পরীক্ষায় প্রথম হতে পারেনি। অথচ সুফলের জ্যাঠামণির ছেলে প্রতি বছর ফার্স্ট হয়ে কত পুরস্কার আনে! সুফল অনুভব করে মায়ের মনের কষ্ট। সত্যি কথা কি চেষ্টার কোনো খামতি নেই তার। কিন্তু আজকের মুখস্থ পড়া কাল দিব্যি যায় ভুলে। স্কুলের শিক্ষকদের কাছে পেয়েছে 'মাথামোটা' বিশেষণ। ইচ্ছে ছিল খেলার মাঠ থেকে একটা কাপ জিতে মায়ের কাছে বলবে, মা। এবার তোমার আশা পূর্ণ হলো তো! কিন্তু সুফলের খেলার মাঠের লড়াই বাছাই পর্বেই শেষ। স্কুলে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকে জবরদস্ত অভিনয় করেছিল সুফল। নম্বর একশ'তে একশ'। কিন্তু অভিনয়ের জন্য পুরস্কারের বদলে ছিল তাৎক্ষণিক হাততালি আর প্রশংসা।

সুফলদের গ্রাম পলাশপুর। গ্রাম হলে কি হবে, স্কুল, সরকারি অফিসের দৌলতে গাছ কেটে একের পর এক গড়ে উঠেছে কংক্রিটের ইমারত। বলা যেতে পারে পলাশপুর আধা শহর। পলাশপুরের বি.ডি.ও. অফিসে বিগত কয়েক বছর ধরেই হচ্ছে 'অরণ্য সপ্তাহ'। রাজকীয় ভাবে। সাতদিন ধরে চলে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বৃক্ষরোপণ করেন বনদপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। তারপর লাল মোরামের রাস্তার দু'ধারে বসানো গাছ এক মাসেই হয় নিশ্চিহ্ন। লোক নেই জল দেবার। তাছাড়া অভাব নেই ছাগল আর গরুর।

বি.ডি.ও. সাহেবের আক্ষেপ, হাজার হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে অথচ একটা গাছও আলোর ঠিকানা পেল না। গ্রামের মানুষ সচেতন না হলে এ কর্মযজ্ঞ বিফল। কথাগুলো কাঁটার মতো বিঁধেছিল সুফলের বুকে। একটা কিছু করার বাসনায় সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মনের বারুদকে উসকিয়ে দিয়েছিলেন সুপ্রকাশবাবুর রচনার ক্লাস। তাঁর কথায় গাছ লাগাও, দেশ বাঁচাও।

ফুটবল মাঠে বসল সোনালী বৈঠক। মধ্যমণি সুফল। সঙ্গে কচিকাঁচা জনা দশেক ক্ষুদে ক্রিকেটার। সুফল বললে, শোন,

প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই
ছাত্রছাত্রীরা লুফে নিয়েছে

বাংলায় লাখ কথার এক কথা হল বাগ্‌বিধি বা প্রবাদ-প্রবচন। বাচ্য অর্থকে ছাড়িয়ে লক্ষণা বা ব্যঞ্জনাকে তা অতিক্রম করে অর্থে আনে আশ্চর্য চারুতা। তাই বিশিষ্টার্থক বাগ্‌গুচ্ছ, বাগ্‌ধারা বা প্রবাদ-প্রবচন ভাষার আত্মা। পরীক্ষার্থীর পাঠসূচিতেও এই বাগ্‌ধারা অন্তর্ভুক্ত...

কৌতূহলী ছাত্রছাত্রী বা সাধারণ পাঠকও এই বইটি ব্যবহারে উপকৃত হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ছাত্রছাত্রীরা তো উপকৃত হবেই, বইটি সাধারণ পাঠকের কাছেও সমাদৃত হবে।

জ্যোতিভূষণ চাকী

বাগ্‌ধারা সংগ্রহ ২০

সংকলন ও সম্পাদনা : শৈলেন চক্রবর্তী

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা) লিমিটেড

প্রত্যেকের বাড়ির সামনের রাস্তার দু'ধারে দশটি করে গাছ বসাবো। যে যার বাড়ির সামনের গাছের দায়িত্ব তার নিজের। ক্ষুদে সন্তুর ভাবনা, গাছ পাব কোথায়? দলনেতার দায়িত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, সে ভার আমার।

গাছ বসিয়ে লাভ?

বলিস কিরে! লাভ অনেক। ছায়া পাবো। ফল পাবো। পাবো তাজা প্রাণবায়ু। বি.ডি.ও. সাহেবকে দেখিয়ে দেবো, ছোট হলেও আমরা পারি।

শুরু হলো গাছ বসানোর উৎসব। ইউক্যালিপ্টাসের থেকে জাম-জামরুলের গাছ। বাঁশের বাঁখারি আর বাবলা গাছের কাঁটার ডাল দিয়ে বেড়া। দশ কিশোরের প্রতিযোগিতা। প্রতিটি দিন একজন আর একজনের গাছ দেখছে। গাছেরা একটু একটু করে মেলে ধরেছে তাদের সবুজ পাখনা। দশ কারিগরের মিলিত কর্মযজ্ঞে সাড়া পড়ে যায় গ্রামে। প্রশংসা আর টিপ্পনি জোটে তাদের কপালে। কারও মতে, মন্দ কি। রাস্তার ধারে ধারে সারি সারি গাছ যখন মাথা তুলে দাঁড়াবে দেখতে ভালোই লাগবে। কারও মতে, ভূত চেপেছে সুফলের মগজে।

দিন, মাস, বছর যায়। বর্ষা, শীতের পর আসে বসন্ত। নব-নব কিশলয়ে সেজেছে সোনালী সুন্দর প্রকৃতি। একদিন বি.ডি.ও সাহেব স্বয়ং উপস্থিত পলাশপুরে। সুফলের দলের কোমল হাতের তরতাজা গাছ দেখে তিনি হতবাক। সুফল ও তার সঙ্গীদের বললেন, সাবাস। এই তো চাই। শুধু কথার কথায় কোনো কাজ হয় না। দরকার সদিচ্ছা আর একতার বল। টাকার প্রয়োজন হলে বলো! সপ্রতিভ সুফলের জবাব, টাকা লাগবে না স্যার। গাছ বাঁচাতে দরকার জল আর সার। জল তো প্রকৃতি মায়ের দান। রান্নাঘর থেকে আনাজের খোসা, ফ্যান আর গোবর দিয়ে বানিয়েছি সবুজ সার। খোল কিনেছি টিফিনের পয়সা থেকে। দেখছেন না সার আর জল পেয়ে গাছগুলো কেমন নাদুসনুদুস হয়েছে।

সুফলের পিঠ চাপড়িয়ে স্যার বললেন, আমার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে এই পলাশপুর দেখাল এক নতুন প্রভাত। জিপে ওঠার আগে তিনি তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন সুফল ও তার দলবলকে।

কয়েকমাস পরের ঘটনা। শেষ পর্বের সন্দেশ। পলাশপুর ব্লক ডেভোলাপমেন্ট অফিসে 'অরণ্য সপ্তাহ' উৎযাপনের এক সপ্তাহ আগে সুফলের নামে এল চিঠি। সরকারি নীল খামে। প্রেরক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তর বিভাগ। বনসৃজনে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রেক্ষায় সুফলদের সোনালী সম্মান নগদ দশ হাজার টাকা আর সোনার মেডেল।

মায়ের গলায় সোনার পদক পরিয়ে দিয়ে সুফলের জয়োল্লাস, আমরা সোনা জিতেছি মা।

মা গর্বে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। হাসনুহানা হাসিতে খিলখিল করে হেসে উঠল গাছেরা।

ছবি : সুফি

এ ছাড়াও যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে :

বিশ্বনাথ মিত্র (চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান)॥ বিপ্লব পাল (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ)॥ সায়ন মুখার্জী (মকদমপুর, মালদা)॥ অভিজিৎ গুহ নিয়োগী (বাগুইআটি, কল-৫৭)॥ সুব্রত সরকার (জগদীশপুর, হাওড়া)॥ দীপক মৃধা (সিউড়ি, বীরভূম)॥ শ্রীরূপা রায় সরকার (বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কল-১২)॥ শুভজিৎ ভাদুড়ী (মালঞ্চপল্লী, মালদা)॥ রাখহরি বন্দ্যোপাধ্যায় (মাহেশ, হুগলী)॥ রীনা কর (বিধানসভা সচিবালয়, কল-১)॥

বিশেষ পুরস্কার

এখন তোমরা আরো পুরস্কার পাচ্ছো। আমাদের লেখক ও বৈজ্ঞানিক ডঃ ডি চন্দ্র তাঁর প্রয়াত পুত্র দেবাশিসের নামে স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচজন লেখককে তাঁর লেখা বই পুরস্কার হিসেবে দেবেন। এই মাসের পুরস্কারপ্রাপকরা : কৃষ্ণদাস চ্যাটার্জী, বিকাশ রায়, বিশ্বনাথ মিত্র, বিপ্লব পাল ও সায়ন মুখার্জী।

ঘোষণা

বিভাকুটি, পি ৪ দক্ষিণী কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, চিংড়িঘাটা, ধাপা, কলকাতা-১০৫ থেকে বিকাশচন্দ্র সেন তাঁর প্রয়াত পিতা বলাই চাঁদ সেনের নামে একটি স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে বলাই চাঁদ সেন স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে মৌলিক লেখা চাইছি।

বিষয়বস্তু

এই গরমে

পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার কার্তিক সংখ্যায় ছাপা হবে। লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ৭ আষাঢ়।

প্রথম পুরস্কার : ১০০ টাকা ☐ দ্বিতীয় পুরস্কার : ৫০ টাকা

চিঠিপত্র

(মতামতের দায়িত্ব সম্পাদকের নয়)

শেষ ম্যাজিক

ফাল্গুন সংখ্যায় বিদ্যুৎ চৌধুরীর 'শেষ ম্যাজিক' গল্পটি আমার খুব ভালো লেগেছে। আরও অ্যাডভেঞ্চার গল্প চাই। এ শুধু আমার একার নয় শুকতারার বন্ধুদের দাবি।

চিরঞ্জিত দাস

(৩২৯, সুভাষ নগর তালপুকুর, রিষড়া, মোড়পুকুর-৭১২ ২০৫, হুগলি)

রূপকথা সংখ্যা

চৈত্র মাসের বিশেষ রূপকথা সংখ্যা এককথায় অনবদ্য। এই সংখ্যায় সব মিলিয়ে ষোলটা গল্প আছে। এত গল্প আগে কোনো সংখ্যায় পাইনি। হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুলও ভালো লেগেছে। ক্রীড়াঙ্গন বিভাগে নতুন নতুন আকর্ষণীয় ছবি দেওয়া হয়েছে দেখে ভালো লাগলো।

অভিজিৎ দাস

(প্রযত্নে-কৃষ্ণপদ দাস, বিধান শিশু সরণী পুলিশ হাউজিং কমপ্লেক্স, ব্লক-এ২, রুম নং-৩০৩, কলকাতা-৭০০ ০৫৪)

দুই বন্ধুর কাহিনী

শুকতারার ফাল্গুন সংখ্যা খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে সত্যপ্রিয় নন্দীর 'দুই বন্ধুর কাহিনী' গল্পটি খুবই ভালো লেগেছে।

স্বপন মণ্ডল

(গোপালপুর ঘাট, জেলা-নদীয়া-৭৪১ ১২২)

ছবি দেখে ছড়া লেখো

শুকতারায় 'ছবি দেখে ছড়া লেখো' নামে একটা বিভাগ করলে কেমন হয়? আপনারা একটা ছবি দিয়ে দেবেন, সেই ছবি দেখে আট বা বারো লাইনের ছড়া লিখতে হবে। শুকতারার বন্ধুদের নিশ্চয় ভালো লাগবে।

দেবাশিস বড়ুয়া

(৩৯৫ এ, আর এন গুহ রোড, দমদম, কলকাতা-৭০০ ০২৮)

ভীষণ ভালো লাগে

আমার বয়েস প্রায় কুড়ি। শুকতারা পড়ছি সেই ছোটবেলা থেকে। আজও শুকতারা আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। তাই শুকতারার বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। শুকতারা আজও আমার ভীষণ ভালো লাগে।

রবিশঙ্কর ঘোষ

(প্রযত্নে-বিমল জড়, পোঃ-আকালপৌষ, জেলা-বর্ধমান-৭১৩ ১৫৭)

পুরস্কৃত সেরা চিঠি

জীবে প্রেম করে যেই জন......

গত ১২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বারাসত থেকে ট্রেনে উঠেছিলাম। যখন হৃদয়পুরে পৌঁছেছি, এক ভদ্রলোক একজন অন্ধ বৃদ্ধাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আমাকে অনুরোধ করলেন, ভাই দয়া করে এই বৃদ্ধাকে মধ্যমগ্রাম স্টেশনে নামিয়ে দিলে তোমার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকব।

একে তো আমাদের দেরি হয়ে গেছে—তার ওপর এই ঝামেলার মধ্যে না যাওয়ার জন্যে আমার বন্ধুরা অনুরোধ করল আমাকে। আমিও একটু বিরক্ত হয়ে 'পারবো না' বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ল স্বামীজীর সেই অমরবাণী,

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

বুঝতে পারলাম, কত বড় ভুল করতে যাচ্ছিলাম। যাঁর জন্যে এমন পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছি, তাঁর নির্দেশই যদি পালন না করলাম তবে কী লাভ এ সবে? আমি বৃদ্ধাকে হাত ধরে এনে আমার সিটে বসতে দিলাম। বন্ধুরা আমায় ফেলে চলে গেল। মধ্যমগ্রাম স্টেশন এলে আমি ওঁকে হাত ধরে নামিয়ে অটোয় করে বাড়ি পৌঁছে দিলাম। তিনি বললেন, তোমার অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম। প্রার্থনা করি, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ঐ বৃদ্ধাকে সাহায্য না করে স্বামীজীর জন্মদিন পালনের মধ্যে দিয়ে আমার বন্ধুরা কতটা পুণ্য অর্জন করেছিল, আমি জানি না; তবে এটা নিশ্চয়ই জানি—সেদিনের সেই পুণ্যলগ্নে স্বামীজীর মহান আদর্শ পালন করার ফল হিসেবে তাঁর একটু আশীর্বাদ হয়তো পেয়েছিলাম এবং সেটাই চিরকাল আমার চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে।

প্রদীপ চন্দ্র গাইন

(গ্রাম-নেতাজী পল্লী, ডাকঘর-ন'পাড়া, বারাসত, উঃ ২৪ পরগনা-৭৪৩ ৭০৭)

কোন ঠিকানায় লিখবো?

শুকতারার চিঠি কোন ঠিকানায় লিখবো—১১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ না ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯?

শাক্য সিংহ

(১০৩/২/ই, বিষ্ণুপুর রোড, মধুপুর, বহরমপুর-৭৪২ ১০১, মুর্শিদাবাদ)

[দুটোর মধ্যে যেকোনো একটা ঠিকানায় লিখলেই হবে]

রূপকথা সংখ্যা চাই

রূপকথার গল্প পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। আপনারা যদি রূপকথা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন তাহলে খুব ভালো হয়।

সুশোভন দাস

(প্রযত্নে-প্রসাদ মিশ্র, পোঃ-জজকোর্ট, অরবিন্দনগর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১ ১০১)

[গত চৈত্র সংখ্যাটিই তো 'রূপকথা' সংখ্যা ছিল]

ভূতের গল্প

ভূতের গল্প পড়তে আমাদের খুব ভালো লাগে। মণিলাল মুখোপাধ্যায়ের 'দুঃখীরাম শান্তিরাম'-এর গল্প অনেকদিন ছাপা হয়নি। কবে হবে?

দেবী, কেয়া, বিল্টু, তপন

(পটাশপুর)

সেরা চিঠি

সেরা চিঠি প্রতিযোগিতায় শুকতারার পাঠক-পাঠিকারা যে কোনো বিষয়ের ওপর (রাজনীতি বাদ দিয়ে) চিঠি লিখতে পারে। সেরা চিঠিটি শুকতারায় ছাপা হবে এবং তার জন্যে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আনুমানিক একশো শব্দের মধ্যে চিঠি লিখতে হবে। যত খুশি চিঠি পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি চিঠির সঙ্গে নিচের কুপনটি থাকা চাই। কুপন ছাড়া কোনো চিঠি গ্রাহ্য হবে না। সেরা চিঠি মনোনয়নের ব্যাপারে শুকতারার সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। চিঠি পাঠাতে হবে সম্পাদক শুকতারার নামে। খাম বা ইনল্যান্ডের ওপর 'সেরা চিঠি' কথাটি লিখে দিতে হবে।

আমি শুকতারার 'সেরা চিঠি' প্রতিযোগিতায় আমার মনোনীত বিষয় নিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। চিঠির মতামত সম্পূর্ণ আমার।

স্বাক্ষর (পুরো নাম) ....

সম্পূর্ণ ঠিকানা ....

কোকিল কেন কাকের বাসায়

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

ধ্রুবকাকুকে পাড়ার ছেলেমেয়েদের খুব পছন্দ। বিশেষ করে বাপ্‌পা-অন্তু-বাবাই-পাপাই-পম্পা-টুটুনরা ধ্রুবকাকুর কাছে আসতে ভালোবাসে। প্রায়ই ওরা বিকেলে একটু তাড়াতাড়ি খেলার মাঠের পাট চুকিয়ে হাজির হয় ওদের ওই পছন্দসই কাকুটির কাছে। উনি ওদের মতো ছোটদের জন্যে লেখেন। সে সব লেখা নানা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। ছাপা হবার আগে প্রায় সব লেখাই ওঁর ভক্ত এই সব ছেলেমেয়েদের শোনা হয়ে যায়।

ধ্রুবকাকু মাঝে-মধ্যে পাখিদের কথা বলেন। পাখিদের নানা খবর রাখেন উনি। পাপাই সেদিন বললো, কাকু, সেই পাখিগুলোর কথা আর একবার বলুন না।

পাপাইয়ের কথা শুনে ধ্রুবকাকু হাসতে হাসতে বললেন, এ তো আমাকে মহা মুশকিলে ফেললে। আমি তো সেই পাখি বলে কোনো পাখিকে চিনি না পাপাই।

পাপাইয়ের কথা শুনে বাবাই-অন্তু-টুম্পারাও হেসে ফেলে। সত্যিই তো। সেই পাখি বললে কোন পাখি, তা বোঝা যায়।

পাপাই ওর ভুল বুঝতে পেরে বলে, কাকু, আফ্রিকার সেই কুমীরদের বন্ধু পাখিদের কথা বলতে বলছি।

ও, বুঝেছি। হ্যাঁ, পাখিগুলো অবশ্যই কুমীরদের বন্ধু। ওঃ, সে তো ক-ত আগে শুনিয়েছি। তোমার ঠিক মনে আছে তো দেখছি।

আর সবাই বললো, আমাদেরও মনে আছে কাকু। আপনি তো সেবার আকাশবাণীর ছোটদের আসরে দেশ-বিদেশের পাখিদের কথা বলতে গিয়ে আফ্রিকার ওই পাখিগুলোর কথা বলেছিলেন। বলুন না আর একবার।

ধ্রুবকাকু বললেন, শোন, ওই পাখিগুলো সত্যিই কুমীরদের পরম বন্ধু। কুমীরদের বেশ উপকারে লাগে ওরা। আফ্রিকার নদীতে যে কুমীর আছে বেশ, সে-খবর তো তাহলে তোমরা আগেভাগেই জেনে ফেলেছ। নদীর জলের ওই কুমীরগুলো মাঝে মাঝে ডাঙায় উঠে আসে।

ছেলেমেয়েরা বলে, তারপর?

তারপর আর কি। ওরা ডাঙায় উঠে এলেই ঝাঁকে ঝাঁকে এক ধরনের ছোট পাখিরা উড়ে এসে ভিড় জমায় ওদের আশে-পাশে। বন্ধু পাখিগুলো সব জুটেছে দেখে কুমীরগুলো বিরাট হাঁ করে। আর চোখ পিটপিটিয়ে ভালো মানুষের মতন পড়ে থাকে।

ধ্রুবকাকু থেমেছেন দেখে ছেলেমেয়েরা আবার বলে ওঠে, তারপর?

তারপর ওই পাখিগুলো এক একটা কুমীর বেছে নিয়ে পালে পালে ঢুকে যায় কুমীরদের হাঁ-করা মুখের মধ্যে।

বাবা রে! তারপর?

আসলে ওই কুমীরগুলোর দাঁতের গোড়ায় গোড়ায় এক ধরনের পোকা হয়। পাখিরা ওই পোকাগুলো কুমীরদের দাঁত থেকে খুঁটে খুঁটে খায়।

পম্পা বললো, আচ্ছা কাকু, এই সময় যদি কুমীরগুলো ওদের হাঁ-করা মুখগুলো বুজিয়ে নেয়, তাহলে তো পাখিগুলো খতম?

ধ্রুবকাকু বললেন, না, তা ওরা করে না। কারণ পাখিরা যখন ওদের দাঁতের গোড়ার পোকা খোঁটে, তখন কুমীরদের ভীষণ আরাম হয়। ওরা চোখ বুজে চুপচাপ পড়ে থাকে। একটুও নড়া-চড়া করে না।

ঠিক এই সময় একটা কোকিল ডাক ছাড়তে ছাড়তে ধ্রুবকাকুর গল্পের আসরের ওপরের আকাশ দিয়ে উড়ে গেল। দেখা গেল, একটা কাক কোকিলটাকে তাড়া করেছে।

ধ্রুবকাকু আসর বসিয়েছিলেন ওঁদের দোতলার ছাদে। সময় পেলে উনি মাঝে মাঝে ওখানে বসেও লেখেন। ওঁদের বাড়ির পাশেই একটা অশ্বত্থ গাছ। ওই গাছটা থেকেই কোকিলটা আর তার পিছনে ওই কাকটা উড়ে গেল বলে মনে হলো। ছেলেমেয়েদের সবার নজর উড়ন্ত ওই পাখি দুটোর দিকে। ধ্রুবকাকুও দেখছিলেন।

পাপাই বললো, কাকু, কোকিলটা বোধহয় কোনো অন্যায় করেছে, তাই কাকটা ওর পিছনে তাড়া লাগিয়েছে, না?

পাপাইয়ের প্রশ্নটা সবারই ভালো লাগলো। কারণ ওরা জানে, ওদের ধ্রুবকাকু কাক-কোকিলের ব্যাপার নিয়েও কিছু বলতে পারেন। পাপাইয়ের প্রশ্নের জবাবে ধ্রুবকাকু ছেলেমানুষের মতো একমুখ হাসলেন। তারপর বললেন, শোন, কোকিলটা কিন্তু চাইছে কাকটা ওকে অনেক দূর পর্যন্ত তাড়া করুক।

বাবাই-পাপাইদের দল বলে, তার মানে? কোকিলটা কি তাহলে কোনো অন্যায় করেনি?

না, ও কোনো অন্যায় করেনি। করছে ওর কোকিলা। আসলে হয়েছে কি জানো? ঠিক এই সময়েই কোকিলা কাকের বাসায় ডিম পাড়ার সুযোগ করে নিচ্ছে।

ছেলেমেয়েরা চোখ বড় বড় করে বলে, আমরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না কিন্তু। আপনি আরও পরিষ্কার করে বলুন।

ধ্রুবকাকু খুশি হলেন পাখিদের সম্বন্ধে ওদের কৌতূহল দেখে। বললেন, শোনো, তোমরা বোধহয় সবাই জানো, কাকের বাসায় কোকিলা ডিম পাড়ে আর ওখানেই ওদের বাচ্চারা বড় হয়।

সবাই বললো, শুনেছি, শুনেছি।

ব্যস, তা যখন জানো, তখন আর ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে কোথায়। শোনো বলি। কাকের বাসায় কাকের নিজেরও তো ডিম থাকে। আর সেই সব ডিম থেকে ছানা বার করবার জন্যে কাকেরা ডিমে তা দিয়ে বসে থাকে। কাজেই তখন কাকের বাসায় কোকিলা ডিম পাড়তে গেলে তাকে আর প্রাণে বাঁচতে হবে না। ওরা ঠুকরেই মেরে ফেলবে।

ছেলেমেয়েরা বলে, তাহলে?

সে কথাই তো বলছি। কোকিলরাও কম চালাক নয়। পুরুষ কোকিল এই সময় ছল করে কাকের বাসার কাছাকাছি ঘোরা-ঘুরি করে। ওকে দেখে তা দিতে বসা মা-কাকটা ভীষণ রেগে যায়। মনে করে, কোকিল ওদের ডিম নষ্ট করতে এসেছে। তাই তখন তা দিতে বসা ডিম ফেলে মা-কাক কোকিলকে তাড়া করে। কোকিল তো তা-ই চায়। কোকিল তখন উড়তে থাকে আর কাকও ওর পিছনে উড়তে উড়তে অনেক দূরে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এদিকে কোকিলাও এই অবসরে অনেকখানি সময় পেয়ে যায়। কাকের ফাঁকা বাসায় ওদের ডিমের ভিড়ে ডিম পেড়ে দিয়ে চলে আসে। আর মা-কাকও কোকিলকে অনেক দূর পর্যন্ত তাড়া দিয়ে ফিরে এসে কোকিলের ডিম সমেত ওদের ডিমে আবার তা দিতে বসে যায়। কোকিলের কারসাজি বুঝতেই পারে না। এরপর কি ব্যাপারটা হয়, তা তো তোমরা বুঝতেই পারছো। কোকিলরা কাককে দিয়ে ডিমে তা দেওয়া আর বাচ্চা বড় করিয়ে নেওয়ার কাজটা করিয়ে নেয়।

ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে শুনতে শুনতে বলে, কি মজা! কাকু, তারপর?

তারপর আর কি। কাকের বাচ্চাও কালো আর কোকিলের বাচ্চাও কালো। কাকেরা বুঝতেই পারে না যে, ওদের বাচ্চাদের সঙ্গে কোকিলের বাচ্চাদেরও বড় করার ব্যাপারে ওরা বেগার খেটে মরছে।

ধ্রুবকাকুর কথা শুনে ছেলেমেয়েরা খুশিতে হাততালি দিয়ে ওঠে। পাপাই বলে, কাকু, তা না হয় হলো, কিন্তু কোকিলরা কাকের বাসায় ডিম ফুটিয়ে ওদের ছানা বড় করিয়ে নেয় কেন?

ধ্রুবকাকু বললেন, সে কথা শুনতে হলে তোমাদের একজন একটু কষ্ট কর। নিচে আমার ঘরে যাও। দেখবে, আমার টেবিলের ডান দিকে কয়েকখানা পত্রিকা আছে। সেগুলো থেকে এমাসের 'শুকতারা' পত্রিকাখানা নিয়ে এসো দেখি। ওই পত্রিকায় পাপাইয়ের প্রশ্নের জবাবেই একটা গল্প লিখেছি। ওটা পত্রিকায় পাঠাবার আগে তোমাদের পড়ে শোনানো হয়নি।

বাবাই তিলমাত্র বিলম্ব না করে নেমে গেল ধ্রুবকাকুর ঘরে। নিয়ে এলো রং-ঝলমলে মলাটের 'শুকতারা' পত্রিকাটি।

ধ্রুবকাকু বললেন, তাহলে শোনো। পড়ে শোনাই গল্পটি। সে অনেক কাল আগের কথা। এক গ্রামে দুই বন্ধু ছিল। একজনের নাম সুজন আর একজনের নাম কুজন। সুজনের থেকে কুজন বয়সে বড়। তা হোক, তবু ওরা বন্ধু। কুজনই নিজের গরজে সুজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। কুজন নামের মানুষটি স্বভাবে ছিল কু-জন, অর্থাৎ মন্দ লোক। বড় স্বার্থপর সে। একে-ওকে-তাকে বেগার খাটিয়ে সে নিজের কাজ গুছিয়ে নিতো।

গ্রামের সবাই কুজনের এই স্বভাবের কথা জেনে গিয়েছিল। তাই কেউ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক বজায় রাখেনি। শুধু কি তাই? কুজনের ধারে-কাছে আসতো না কেউ। ধড়িবাজ লোকটা সুজনকে খুঁজে খুঁজে বার করেছিল। কারণ সে নামে আর কাজে সত্যিই সুজন। অপরের কাজ করতে পেলে নিজের কাজ-কর্ম ভুলে যেত। অনেক সময় আমরা তো ভালো মানুষকে বোকা মনে করি। কুজনও সুজনকে ভাবতো তা-ই। ভাবতো, সুজন খুব বোকা। কারণ সে কুজনের অনেক কাজ করে দিত। বিনিময়ে কি পেল না পেল, তার হিসাব রাখতো না।

পাড়ার লোক সুজনকে বলতো, সুজন, কুজনের সঙ্গ ছাড়। ও মন্দ লোক। ওর কাজ-কম্ম বিনি পয়সায় করিস কেন? যদিও বা করিস, কাজ করতে অকাজ করে দিবি, যাতে ওর লোকসান হয়। তবেই ও জব্দ হবে।

সুজন বলতো, এ কি মন্দ যুক্তি দিচ্ছ গো তোমরা। মন্দ লোকের মন্দ করতে করতে আমি নিজেও মন্দ হয়ে যাবো যে। ঠাকুর শাস্তি দেবেন না?

কুজন মন্দ হলেও সুজন বন্ধুত্ব বজায় রেখেই চলে। সুজনের সংসারে ও একা।

বাপ-মা মারা গেছে সে অনেক বছর আগে। বোনেদের বিয়ে-সাদি হবার পর তারা এখন যে যার সংসারে ব্যস্ত।

কৃজনের দুই ছেলে আর বউ। স্বার্থপর কৃজন নিজের সুখ ছাড়া আর কিচ্ছুটি বোঝে না। বউটার অসুখ করলো। তার জন্যে না চিকিৎসা, না সেবা। বেচারা ভুগতে ভুগতে একদিন মারা গেল। তাতে কৃজনের তেমন কিছু দুঃখ হলো না। ঝামেলায় পড়লো দুটো ছেলে নিয়ে। ছেলে দুটোর মা যতদিন বেঁচে ছিল, ওদের সব ঝামেলা-ঝক্কি সে একাই সামাল দিত। স্বার্থপর কৃজন সংসারে মজা করে খেয়েছে আর আমোদ করে বেড়িয়েছে। এখন ছেলে দুটোর সব দায়িত্ব এসে পড়লো কৃজনের ঘাড়ে।

কৃজন ভেবে দেখলো, ছেলে দুটোকে সামলাতে গেলে তার জীবনে আমোদ-আহ্লাদ বলে কিছু থাকবে না। তাই সে একটা মতলব আঁটলো।

একদিন সুজনকে গিয়ে বললো, বন্ধু, তোমার মতন মানুষ আর হয় না। তুমি যদি ভাই, আমার একটা কাজ করতে...

সুজন জানে কৃজনের কোনো মতলব আছে। তা বুঝেও সে বললো, বলো, কি কাজ?

কৃজন হাত কচলিয়ে বললো, না ভাই, কাজ মানে কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। আসলে ছেলে দুটোর মা মারা যাবার পর মন খারাপে আমি চারদিক অন্ধকার দেখছি। সংসারে মন টিকছে না। তাই বলছিলুম, তুমি যদি আমার একটু উপকার করতে।

দ্যাখো দাদা, তুমি আমার বন্ধু। তোমার উপকার করাটা যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয়, তাহলে তা আমি নিশ্চয়ই করবো।

কৃজন শয়তানের হাসি হেসে বলে, না, অন্য কিছু নয়। আমি মনটাকে ঠিক করে নেবার জন্যে দিনকতক বাইরে যাবো। তুমি যদি সেই কদিন আমার ছোট ছোট ছেলে দুটোকে তোমার সংসারে রাখতে। ওরা কিন্তু তোমাকে খুব ভালোবাসে।

সুজন বললো, এই কথা? বেশ তো। আমি তো এখনো বিয়ে-থা করে সংসার পাতিনি। ওদের দুটিকে নিয়ে দিনকতক বেশ থাকা যাবে।

পরের দিনই কৃজন ছেলে দুটোকে সুজনকে গছিয়ে দিয়ে কেটে পড়লো। সেই যে গেল আর ফিরলো না। মাস যায়, বছর যায়, আরও কয়েক বছর যায়, কৃজন ফিরলো না।

বেচারা সুজন কি আর করে। ছেলে দুটোকে তো তার মতো মানুষ তাড়িয়ে দিতে পারে না। সে তাদের নিজের ছেলে মনে করে মানুষ করতে লাগলো। ফলে বিয়ে-সাদি করে তার নিজের সংসার পাতার সময় মিললো না।

ছেলে দুটি সুজনের শিক্ষায় দিনে দিনে কাজে-কর্মে বেশ নিপুণ হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে ওরা ওদের বাবার খবর জিজ্ঞেস করে। মন খারাপ হয় অনেক-দিন-না-দেখা বাবার জন্যে। সুজন তাদের সান্ত্বনা দেয়। বলে, তোদের বাবা বাণিজ্য করতে গেছে অনেক দূরের দেশে। ফিরতে একটু সময় লাগবেই তো বাবা। দেখবি, তোদের বাবা যখন ফিরবে, তোদের জন্যে কত কি আনবে।

অবশেষে একদিন কৃজন ফিরে এলো। সরাসরি উঠলো সুজনের বাড়িতে। দেখলো, সুজনের যত্ন আর ভালোবাসায় তার ছেলে দুটি বেশ বড়-সড় হয়েছে। স্বার্থপর কৃজন ভাবলো, এবার ছেলে দুটিকে খাটিয়ে ওদের রোজগারের পয়সায় বেশ থাকা যাবে। আর সুজনকে বেগার খাটিয়ে ছেলে দুটোকে মানুষ করে নেওয়াও হলো।

কৃজন মিথ্যে করে বললো, সুজনভাই, আমার বিপদের কথা তোমায় শোনাই শোনো। বিদেশে গিয়ে ভয়ঙ্কর অসুখ হয়েছিল আমার। বাঁচার আশা থাকেনি। যাহোক করে সুস্থ হতে পেরেছি। তোমার জন্যে মনটা হু-হু করে উঠলো। তাই চলে এলুম। তা ভাই, আমার ছেলে দুটি এবার আমাকে ফেরৎ দাও। তোমাকে আর ওদের জন্যে ঝামেলা করতে হবে না। তুমি এবার তোমার ছেলেপুলে নিয়ে থাকো।

সুজন বললো, বন্ধু, আমার আবার ছেলেপুলে কোথা? তোমার ছেলেদের মানুষ করতে গিয়ে আমার আর সংসার পাতাই হলো না। তা এক কাজ করো না বন্ধু। তোমার একটি ছেলে আমাকে দাও। একজন থাকলেও আমি আমার বাড়িতে একলা থাকা থেকে রেহাই পাবো। আর বড়ো বয়েসে সে আমার খানিক সহায় হবে।

কৃজন রাজী হলো না। সে দুটি ছেলে নিয়ে চলে গেল নিজের বাড়িতে। বেচারা সুজন তার বাড়িতে বড় একা হয়ে পড়লো।

সুজনের মনটা খারাপ। মনটাকে মেরামত করে নিতে প্রতিদিনের মতো সেদিন সন্ধ্যায় সে একমনে ঠাকুরকে স্মরণ করতে বসলো। সুজনের প্রাণ-ছোঁয়া ডাকে ঠাকুর হাজির হলেন সুজনের সামনে। বললেন, মন খারাপ করো না। বলো, তুমি কি চাও?

সুজন বললে, ঠাকুর, কৃজনের ব্যবহারে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। ছেলে দুটো চলে যাবার পর থেকে বাড়িটাও কেমন খাঁ-খাঁ করছে। তুমি ঠাকুর, আমার একটি সাধ পূরণ করে দিও। পরের জন্মে তুমি আমাকে দুনিয়ায় মানুষ করে পাঠিও না। পাখি করে দিও।

এই বলে সুজন ঠাকুরকে প্রণাম করতে ঠাকুর বললেন, তথাস্তু। আগামী জন্মে তুমি হবে গান-গাওয়া পাখি। সব মানুষকে তুমি গান শোনাবে। সবার ভালোবাসা পাবে। আর ওই কৃজন, ওকেও পাখি করে দেবো। তবে ও কোনো মানুষের ভালোবাসা পাবে না। ও ডাকলেই সবাই দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেবে। আর শোনো সুজন, ও যেমন তোমাকে বেগার খাটিয়ে ওর দুটো ছেলেকে তোমার ঘরে মানুষ করে নিলে, ওই বেগার তুমি ওই কৃজনকে দিয়ে খাটিয়ে নেবার সুযোগ পাবে। এই বলে ঠাকুর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অবশেষে এক সময় সুজন-কৃজনেরা আগে-পরে মারা গেল। ঠাকুরের ইচ্ছা মতো তারা দুই কালো পাখি হয়ে জন্মালো। সুজন হলো কোকিল আর কৃজন হলো কাক। স্বার্থপর কৃজন কাক হয়ে আজও কোকিল সুজনদের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চাদের বড় করে দিয়ে সুজনকে বেগার খাটানোর ঋণ শোধ করে চলেছে।

ছবি : মদন সরকার

চ্যাম্পিয়ন হবে কে—ফ্রান্স না আর্জেনটিনা ?

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

রোমানিয়ার বিরুদ্ধে গোল করার পর সহ-খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাচ্ছেন জিদান।

এই মাসের শেষ দিনটিতে এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। গোটা বিশ্বের নজর এই মুহূর্তে এশিয়ার দুটি দেশের দিকে। জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়া এবারের প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা। তাই এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় একটা বা দুটো নয় এশিয়ার চারটি দল খেলবে। এই চারটি দেশ হলো—জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও সৌদি আরব। একটা ব্যাপারে এবার আমরা নিশ্চিন্ত। এবার খুব বেশি রাত জেগে খেলা দেখতে হবে না। কারণ খেলাগুলো হবে দক্ষিণ কোরিয়া আর জাপানে।

বিশ্বকাপের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই কে চ্যাম্পিয়ন হবে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা তুঙ্গে উঠছে। যাঁরা বিশ্ব ফুটবলের খবর-টবর রাখেন তাঁদের মতে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স আর আর্জেনটিনার মধ্যে যে কোনো একটি দল চ্যাম্পিয়ন হবে। আমাদের ধারণা, পাল্লা ভারী গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের দিকে। তবে পিছিয়ে নেই আর্জেনটিনাও। এক দলের মতে চান্স বেশি ফ্রান্সের, অন্য দল মনে করছে ফ্রান্স নয় এবারের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার সম্ভাবনা বেশি আর্জেনটিনার।

ফ্রান্স গতবারের চ্যাম্পিয়ন তাই তাদের বাছাই পর্বে খেলতে হয়নি। বিশ্বকাপের বাকি ২৯টি (জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়া উদ্যোক্তা — ওরাও খেলেনি) দেশের পারফরমেন্স পরখ করা হয়ে গেছে বাছাই পর্বের খেলায়। তাই ফ্রান্স কিংবা উদ্যোক্তা দেশ দুটির শক্তির পরিচয় ঠিক তেমনভাবে পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে আর্জেনটিনার পারফরমেন্সই তাঁদের বিশ্বকাপের ফেবারিট দল বলে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। কিন্তু আর্জেনটিনার রাজনৈতিক অস্থিরতা খেলোয়াড়দের ওপর প্রভাব না ফেলে বসে। আর্জেনটিনার মানুষের রক্তে ফুটবল। তাই তারা একাট্টা হয়ে লড়ে যাবে বলেই মনে হয়। তা যদি হয় তাহলে তারা ফ্রান্সের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকবে।

তাই বলে কেউ যদি জিদানের দল ফ্রান্সকে খাটো চোখে দেখেন তাহলে ভুল হবে। ফ্রান্সের মানুষ এখন তাকিয়ে আছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন দলের হিরো জিদানের দিকে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, জিদান কোনোদিনই পেলে বা মারাদোনা হতে পারবেন না। ওঁরা দুজনে যে কোনো খেলার ভাগ্য গড়ে দিতে পারতেন। সে ক্ষমতা জিদানের নেই। তা ছাড়া গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল বলে ওদের কাছে সকলের প্রত্যাশা থাকবে অনেক বেশি। ফলে খেলোয়াড়দের ওপর খানিকটা বাড়তি চাপ পড়বেই। সে দিক দিয়ে চাপমুক্ত থাকবে আর্জেনটিনা।

এবারের আগে যতবার বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়েছে, ততবারই ব্রাজিল ছিল শিরোনামে। তার পাশাপাশি আসতো বেকেনবাউয়ারের দল জার্মানি। কিন্তু এই দুটি দেশই এতটাই পিছিয়ে পড়েছে যে সম্ভাব্য বিজয়ীর ব্যাপারে ব্রাজিল কিংবা জার্মানির কথা কেউ উচ্চারণও করছেন না। ব্রাজিল এবং জার্মানিকে বাছাই পর্বের শেষ খেলাটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল জাপান-কোরিয়ায় খেলতে যাবার ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে।

জার্মানি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা না গেলেও ব্রাজিলকে একেবারে খরচের খাতায় ফেলা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ওদের রক্তে ফুটবল। তাই ওরা কখন যে কী করে বসবে কেউ বলতে পারে না। বলের রাজা পেলের দেশ ব্রাজিল। বিশ্বকাপের বেশ কয়েক মাস আগে পেলে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা শুনলে ব্রাজিলের ঐ হাল হতো না। পেলে বলেছিলেন, ইউরোপীয় ধাঁচে খেলতে গিয়ে ব্রাজিল ভুল করেছে। সেই ধাঁচ ভুলে গিয়ে খেলোয়াড়রা যদি তাদের স্বাভাবিক খেলা খেলে তাহলে পরিস্থিতি বদলে যাবে। আর সেই জন্যে দরকার একজন যোগ্য কোচের হাতে দলটি তুলে দেবার। পেলের সেই পরামর্শ অবশ্য গ্রহণ করেননি ব্রাজিলের ফুটবল কর্তারা।

শুধু ব্রাজিল নয় গোটা বিশ্ব এবার বিশেষভাবে তাকিয়ে থাকবে রোনাল্ডোর দিকে। চোট-আঘাত রোনাল্ডোকে যথেষ্ট জ্বালিয়েছে একথা ঠিকই তবু গত চার বছরে রোনাল্ডো আরও বেশি পরিণত হয়ে উঠেছেন। বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়ের স্থানটি মারাদোনার পর আর কেউ অধিকার করতে পারেননি। রোনাল্ডো কী এবার পারবেন? আর কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সে যাই হোক, এবারের বিশ্বকাপের মূল পর্বে মোট ৩২টি দেশ খেলবে। প্রত্যেক বিভাগে চারটি করে দেশ রেখে মোট আটটি বিভাগে প্রথম পর্বের খেলা হবে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠান দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে। উদ্বোধনী ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স খেলবে দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী সেনেগালের সঙ্গে। ফ্রান্সের পর যে দেশটির দিকে সবার নজর থাকবে সেই আর্জেনটিনার প্রথম খেলা জুন মাসের ২ তারিখে নাইজিরিয়ার সঙ্গে। নাইজিরিয়ার সুনাম জায়েন্ট কিলার হিসেবে। ব্রাজিল তাদের গ্রুপের দলগুলি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠা তাদের বাঁয়ে হাত কা খেল। চিন্তা বেড়ে গেছে ইংলন্ডের। তারা মনে-প্রাণে চেয়েছিল কোনোমতেই যেন ফ্রান্স বা আর্জেনটিনার সঙ্গে একই গ্রুপে খেলতে না হয়। লটারির পর দেখা গেল, ইংলন্ড যে ভয় পেয়েছিল তাই ঘটেছে। ইংলন্ডের গ্রুপটা রীতিমতো শক্ত। ইংলন্ডকে লড়তে হবে প্রথম রাউন্ড থেকেই। প্রত্যেক বিভাগ থেকে দুটো করে দল উঠবে দ্বিতীয় রাউন্ডে। ইংলন্ডের পক্ষে ব্যাপারটা রীতিমতো কষ্টকর। শুয়ে-বসে-আয়েশ করার অবসর তারা পাবে না।

নিচে বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ডের বিভাগ বিন্যাস দেওয়া হলো। কোন বিভাগে কোন কোন দেশ আছে দেখে নিলে মোটামুটিভাবে আন্দাজ করা যাবে কোন কোন দেশের দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার সম্ভাবনা আছে।

নিচের গ্রুপগুলির সব খেলা দক্ষিণ কোরিয়ায় হবে

গ্রুপ এ	গ্রুপ বি	গ্রুপ সি	গ্রুপ ডি
ফ্রান্স	স্পেন	ব্রাজিল	দক্ষিণ কোরিয়া
সেনেগাল	স্লোভেনিয়া	তুর্কি	পোল্যান্ড
উরুগুয়ে	প্যারাগুয়ে	চীন	ইউ এস এ
ডেনমার্ক	দক্ষিণ আফ্রিকা	কোস্টারিকা	পর্তুগাল

নিচের গ্রুপের সব খেলাই জাপানে

গ্রুপ ই	গ্রুপ এফ	গ্রুপ জি	গ্রুপ এইচ
জার্মানি	আর্জেনটিনা	ইতালি	জাপান
সৌদি আরব	নাইজিরিয়া	ইকুয়েডর	বেলজিয়াম
আয়ারল্যান্ড	ইংলন্ড	ক্রোয়েশিয়া	রাশিয়া
ক্যামেরুন	সুইডেন	মেক্সিকো	তিউনেশিয়া

এক নজরে বিশ্বকাপ ফুটবল

সাল	বিজয়ী	রানার্স	তৃতীয় স্থান	কোথায়
১৯৩০	উরুগুয়ে	আর্জেনটিনা	প্যারাগুয়ে	উরুগুয়ে
১৯৩৪	ইতালি	চেকোশ্লোভাকিয়া	জার্মানি	ইতালি
১৯৩৮	ইতালি	হাঙ্গেরি	ব্রাজিল	ফ্রান্স
১৯৫০	উরুগুয়ে	ব্রাজিল	সুইডেন	ব্রাজিল
১৯৫৪	পঃ জার্মানি	হাঙ্গেরি	অস্ট্রিয়া	সুইজারল্যান্ড
১৯৫৮	ব্রাজিল	সুইডেন	ফ্রান্স	সুইডেন
১৯৬২	ব্রাজিল	চেকোশ্লোভাকিয়া	চিলি	চিলি
১৯৬৬	ইংলন্ড	পঃ জার্মানি	পর্তুগাল	ইংলন্ড
১৯৭০	ব্রাজিল	ইতালি	পশ্চিম জার্মানি	মেক্সিকো
১৯৭৪	পশ্চিম জার্মানি	হল্যান্ড	পোলান্ড	পঃ জার্মানি
১৯৭৮	আর্জেনটিনা	হল্যান্ড	ব্রাজিল	আর্জেনটিনা
১৯৮২	ইতালি	পঃ জার্মানি	পোলান্ড	স্পেন
১৯৮৬	আর্জেনটিনা	পঃ জার্মানি	ফ্রান্স	মেক্সিকো
১৯৯০	পঃ জার্মানি	আর্জেনটিনা	ইতালি	ইতালি
১৯৯৪	ব্রাজিল	ইতালি	সুইডেন	ইউ এস এ
১৯৯৮	ফ্রান্স	ব্রাজিল	ক্রোয়েশিয়া	ফ্রান্স

স্বাগতম ঃ বিশ্বকাপ ২০০২

অরুণাভ গুপ্ত

দেখতে দেখতে চার বছর ফুরুত করে কেটে গেল। অবশ্য তোমাদের-আমাদের মানে সব বয়সীদের কাছেই এই ঝড়ের গতিতে সময় কেটে যাওয়াটা দারুণ খুশ খবর। কেন বল তো? কেন আবার! বিশ্বকাপ এসে গেল যে। বিশ্বসেরাদের ফুটবল। শুরু হচ্ছে ৩১ মে ২০০২ শুক্রবার। ফ্রান্স বনাম সেনেগাল। স্থান সিওল। ভারতীয় সময় কাঁটায় কাঁটায় বিকেল পাঁচটা। আর শেষ অর্থাৎ ফাইনাল ৩০ জুন রবিবার। স্থান ইয়াকোহামা। বিকেল সাড়ে চারটে। আটখানা গ্রুপ, এ টু এইচ, প্রতি গ্রুপে চারটে করে দেশ খেলছে। সবসুদ্ধ ৩২টি দেশের ফুটবলাররা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। সময় হলেই ঝাঁপাবে। উফ্ ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। আবার আশ মিটিয়ে স্বপ্নের ফুটবল উপভোগ করবো তাই না! আচ্ছা শুকতারার ছোট্ট সোনা পড়ুয়ারা, বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হওয়ার আগে কিছু ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে জাবর কাটা যেতেই পারে। খারাপ লাগবে না।

১৯৯৪-তে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার কথা দিয়ে শুরু করা যাক। ইউ এস এ '৯৪-তে বিশ্ববাসীর ধারণা ছিল সকার ওখানে মোটেই জমবে না। কারণ খুবই স্পষ্ট। আসলে আমেরিকানরা মোটেই সকারভক্ত নয়। ওঁদের ভীষণ পছন্দের খেলা হচ্ছে বাস্কেটবল-বেসবল। সেক্ষেত্রে ফুটবল! ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কিন্তু ঘটনা অন্য খাতে বইলো। ইতালিয়ান, মেক্সিকান এবং আফ্রিকানরা কাতারে কাতারে আমেরিকায় এসে জমায়েত হলেন। এমন অবস্থা প্লেনে ঠাঁই নেই। নামী-দামী-মাঝারি সব হোটেলে তিলধারণের জায়গা নেই। সমর্থকদের হাতে দেশের পতাকা। গিজগিজ করছে মানুষ আর মানুষ। স্টেডিয়ামগুলির যাওয়ার রাস্তায় দর্শকদের ভিড়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এসব দেখেশুনে খোদ আমেরিকানরা বেজায় হতভম্ব। এসব কি ঘটছে রে বাবা! ওঁরাও গা-ঝাড়া দিয়ে ঐ বিশাল জনস্রোতে মিশে গেলেন। ফলে কি হলো? প্রতিটি স্টেডিয়ামে গড়পড়তা দর্শকসংখ্যা এসে দাঁড়ালো ৬৮ হাজার ১০২। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম দর্শক উপস্থিতি আগের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেল। এর আগে রেকর্ড গড়েছিল ইতালিয়া '৯০-তে। ঐ সময় দর্শক সংখ্যা ছিল ৪৮ হাজার ৪১১। সত্যি বলতে কি আয়োজকরা পর্যন্ত হতবাক। যাঁরা আগাম গেয়েছিলেন ইউ এস এ বিশ্বকাপ ফ্লপ করবে তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটে হাওয়া।

বিশ্বকাপ আসরে বিশ্বসেরাদের জন্য নয়া বল আমদানি করলেন অ্যাডিডাস। বলের চরিত্র কিরকম ছিল? দ্রুত ছোটা এবং বাতাসে দ্রুত কেটে যাওয়া। এমন অস্বাভাবিক চরিত্রের জন্য বলের নামকরণ হয়েছিল 'টেরর বল'। মানে ভীতিজনক। স্বাভাবিক কারণেই এমন বলকে বশে আনতে গিয়ে

রোনাল্ডো

ফুটবল্যাররা নাজেহাল। হল্যান্ড এবং সৌদি আরব খোলাখুলি বলেছিল, এমন বল চোদ্দপুরুষে দেখিনি। ওটার জন্যই আমাদের এই হাল। কথাটা মিথ্যে নয়। '৯৪-এর আসরে সৌদির গোলকীপার বলের দ্রুত বাঁক খাওয়ার ধোঁকায় পুরো উল্টো ডাইভ মেরে গোল হজম করেছিল। মানে বল ঢুকলো বাঁদিকে, উনি দিলেন ডানে ডাইভ। পাশাপাশি এই বল সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত চলে আসছে। না-না, বিশ্ব আসরে আমাদের দেশ কল্পনাও করো না। এক যদি কায়দা করে আয়োজক হিসাবে মাথা গলাতে পারে তাহলেই সম্ভব। তবে হ্যাঁ, ভারত কিন্তু খেলছে। মানে প্রতিটি ম্যাচেই। কিভাবে শোনো। ঐ যে বলে খেলা হচ্ছে তার ভিতরে ব্লাডার থাকে। সেই ব্লাডার তৈরি করে সরবরাহ করছে দিল্লির এক কোম্পানি। খেলতে না পারি, কিন্তু খেলার উপকরণ সাপ্লাই করে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসরে তো নিজেদের অস্তিত্ব রেখে দিয়েছি। সেই বা কম কিসের বলো?

খবরটা জানার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত দেশগুলির ফুটবলপ্রেমিকরা স্তম্ভিত, হতবাক। '৯৪ বিশ্বকাপে ফের মারাদোনা স্বমূর্তিতে হাজির। প্রথম ম্যাচেই গ্রীসের বিরুদ্ধে অসাধারণ গোল করে প্রমাণ করে দিলেন মারাদোনা মারাদোনাতেই আছেন। এখানেই থমকে রইলেন না মারাদোনা। নাইজিরিয়ার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আবার ভূমিকা পরিত্রাতার। নিজে গোল না করলেও গোল করালেন। ম্যাচের শুরুতে এক গোল হজম করতেই মারাদোনার আর্জেনটিনা ফুঁসে উঠলো। বিশেষ করে মারাদোনা। একাই একশো। প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ ফালাফালা করে দু-দুখানা সাজানো-গোছানো পাস বাড়ালেন। বলে শুধু টোকা দিলেই সোনা ফলবে। ক্লডিও ক্যানিগিয়া তাই করলেন। ফল ২-১ ব্যবধানে আর্জেনটিনার জয়। তামাম ফুটবল পাগল দর্শক আনন্দে আত্মহারা। আবার দুরন্ত অপ্রতিরোধ্য মারাদোনাকে তাঁরা দেখতে পাবেন। হলো না। ড্রাগ গ্রহণ করেছেন বলে অভিযোগ তুলে সারাজীবনের মতো ফুটবলে ইতি টেনে দিলেন সংগঠকরা। মারাদোনা প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলেন। আমরা হারালাম আমাদের প্রিয় ফুটবলারকে। মর্মান্তিক—তাই না? দেখা যাক এসে যাওয়া জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া আয়োজিত এবারের বিশ্বকাপ নতুন কি বার্তা বহন করে আনে।

মুদ্রায় ফুটবল

প্রবীর কুমার লাহা

ফুটবল বা সকার সব দেশেই খুব জনপ্রিয়। কত ঘটনা, অঘটন ঘটে গেছে এই খেলাকে কেন্দ্র করে। আমাদের দেশেই দেখ না কেন। মোহনবাগান ক্লাবের নাম তো তোমরা সকলেই শুনেছ। তা সেই ক্লাবের খেলোয়াড়রা খালি পায়ে খেলে হারিয়ে দিল কিনা বুটপরা বাঘা বাঘা সব লালমুখো সাহেব খেলোয়াড়দের! ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনাটি ঘটেছিল পরাধীন ভারতে ১৯১১ সালে। হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল সারা দেশে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আলাদা আলাদা ভাবে খেলা হলেও প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বকাপ ফুটবল। ফিফা আয়োজিত সেই প্রতিযোগিতার আসর এ বছর বসছে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায়।

বিশ্বকাপ ফুটবলের স্মারক হিসাবে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে হরেকরকম মুদ্রা ছেড়েছে বাজারে। ১৯৭৭ সালে হাইতি এই খেলা নিয়ে মুদ্রা বার করে। ১৯৮৯ ও ১৯৯১ সালে কিউবা যে মুদ্রা বের করে তাতে থাকে ইটালির তিন খেলোয়াড়ের ছবি ও খেলার দৃশ্য। এছাড়া আরো যে সব দেশ মুদ্রা বার করেছে তাদের মধ্যে আছে—বুলগেরিয়া (১৯৯৮), কাম্পুচিয়া প্রজাতন্ত্র (১৯৮৮), কম্বোডিয়া (১৯৯১, ১৯৯২), মিশর (১৯৯০), ইকোয়েটোরিয়াল গিনি (১৯৯৪), ফ্রান্স (১৯৯৮), জামবিয়া (১৯৯৪), জিব্রাল্টার (১৯৯৪, ৬টি মুদ্রা), আইল.অফ ম্যান (১৯৯৪, ৯টি মুদ্রা), লাওস (১৯৯১), জ্যামাইকা (১৯৮৬, ১৯৯৪), দক্ষিণ কোরিয়া (১৯৮৬, ১৯৮৮), মালদ্বীপ (১৯৯৪), মেক্সিকো (১৯৮৬, ১০টি মুদ্রা), নিকারাগুয়া (১৯৯০), মোজাম্বিক (১৯৯৪), নিভূ (১৯৮৬, ১৯৯০), প্যানামা (১৯৮২), পর্তুগাল (১৯৮৬), সেন্ট টমাস ও প্রিন্স দ্বীপপুঞ্জ (১৯৯০, ৪টি মুদ্রা), তুরস্ক (১৯৮২), জেনেভা (১৯৯৩, ২টি কয়েন), যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯২, ১৯৯৬), দক্ষিণ আফ্রিকা (১৯৯৪), সেচিলেস (১৯৯৩) ও ওয়েস্টার্ন সোমডা (১৯৭৬, ১৯৮০, ১৯৮৬)।

ফুটবল খেলার ওপর মুদ্রা তাই এতে চিত্রিত হয়েছে খেলারই বিভিন্ন আঙ্গিক। কোনোটাতে রয়েছে গোল করার দৃশ্য, কোনোটাতে দেশের মানচিত্র, কোনোটাতে বলে কিক করছে খেলোয়াড়রা। আবার আইল অফ ম্যান যে মুদ্রা বের করেছে তাতে আছে রুমানিয়া বনাম বুলগেরিয়া ও জার্মানি বনাম রাশিয়ার খেলার দৃশ্য। মুদ্রাগুলি রুপো, তামা ও নিকেলের তৈরি। সাইজও বড়। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে ফুটবল নিয়ে মুদ্রা কখনো বেরোয়নি।

ফুটবল খেলার ওপর মুদ্রা সংখ্যায় কম হলেও মুদ্রা-সংগ্রাহকদের কাছে এর অর্থমূল্য কম নয়।

লারা

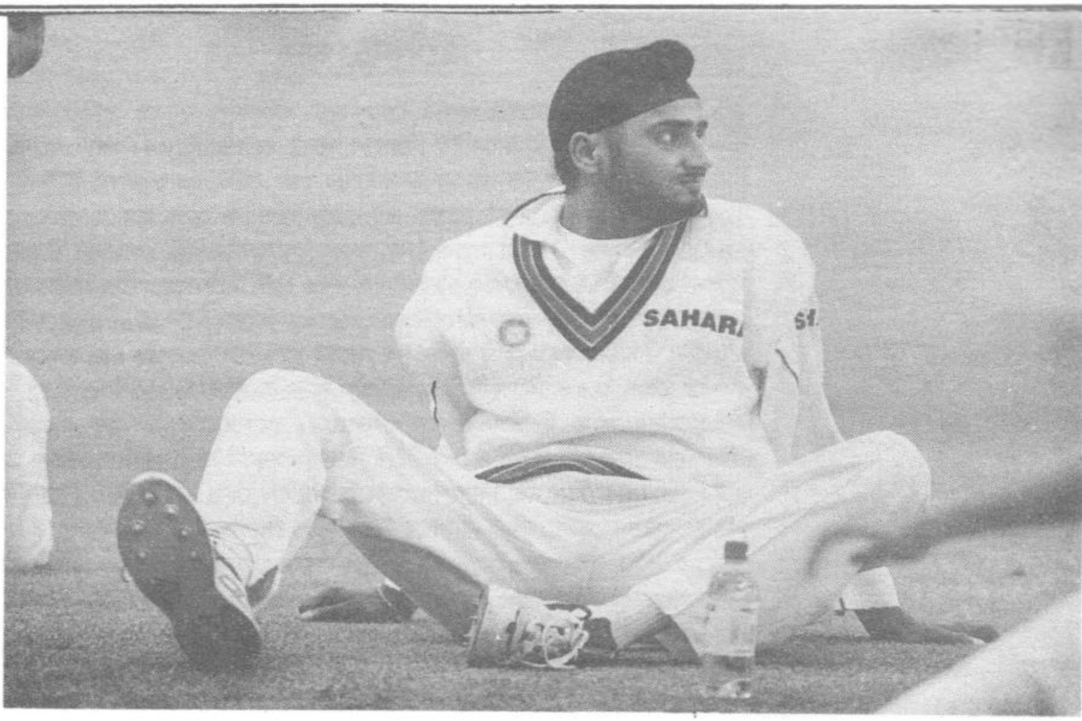

হরভজন সিং

এক নজরে

আমি দুঃখিত ঃ দুশার

যাঁর আঘাতে পা ভেঙেছে ইংলন্ডের ফুটবল ক্যাপ্টেন বেকহ্যামের সেই অ্যান্ডো দুশার ঐ ঘটনার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বেকহ্যামকে টেলিফোন করে তিনি বলেছেন, আমি দুঃখিত। আমি তোমাকে ইচ্ছে করে আঘাত করিনি।

থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ দুশার, খেলায় ঐরকম হয়েই থাকে। আমি সুস্থ হয়ে উঠছি, আশা করি বিশ্বকাপে খেলতে পারব।

নিশ্চয়ই পারবে। খেলতে তোমায় হবেই। আমি বড় লজ্জিত।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি ফোন করলে বলে আমার খুব ভালো লাগছে।

বেকহ্যামকে শুধু ফোন করেই চুপ করে থাকেননি দুশার, সাংবাদিকদের বলেছেন, ওর সঙ্গে দেখা হলে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব। চিকিৎসকরা বলেছেন, আট সপ্তাহের মধ্যেই বেকহ্যাম সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। আমি ওকে 'গেট ওয়েল সুন' কার্ড ও ফুল পাঠিয়েছি।

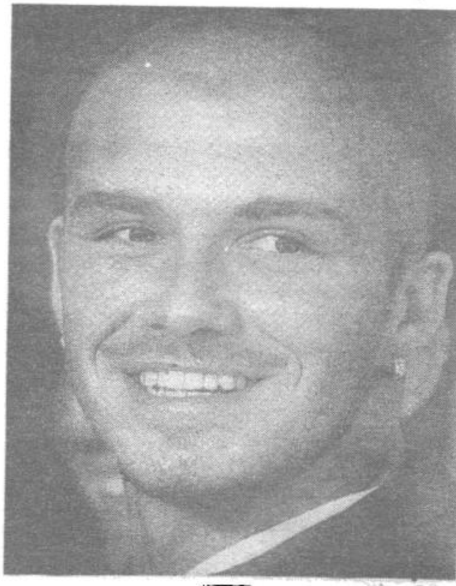

ডেভিড বেকহ্যাম

পাঁচ নম্বরে কার্ল

কার্ল হুপারকে নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের মাত্র ছ'জন ব্যাটসম্যান টেস্ট ক্রিকেটে দু'শর ওপর রান করেছেন বা ডবল সেঞ্চুরি করেছেন ভারতের বিরুদ্ধে। ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যানদের রেকর্ড নিচে দেওয়া হলো—

- ❑ রোহন কানহাই—২৫৬ রান—কলকাতা—১৯৫৮-৫৯ সালে
- ❑ ফাউড ব্যাকাস—২৫০ রান—কানপুর—১৯৫৯-৬০ সালে
- ❑ ক্লাইভ লয়েড—২৪২* রান—মুম্বাই—১৯৭৪-৭৫ সালে
- ❑ ফ্রাঙ্ক ওরেল—২৩৭ রান—কিংসটন—১৯৫২-৫৩ সালে
- ❑ কার্ল হুপার—২২৩ রান—জর্জটাউন—২০০২-০৩ সালে
- ❑ ইভারটন উইকস—২০৭ রান—পোর্ট অফ স্পেন—১৯৫২-৫৩ সালে

নানদোর হিদেকুটি আর নেই।

হিদেকুটি আর নেই

প্রথমে ছিলেন হাঙ্গেরি দলের খেলোয়াড়। বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় যেমন খেলেছেন তেমনি হাঙ্গেরির বিশ্বকাপ দলের কোচও ছিলেন। সদ্য ৮০ বছর বয়সে প্রয়াত হওয়ার আগে পর্যন্ত ফুটবল উৎসাহীদের মনে একটি প্রশ্ন হামেশাই উঁকি-ঝুঁকি মারত, হিদেকুটি খেলোয়াড়, হিদেকুটি কোচ—এই দুয়ের মধ্যে কে কাকে হারাতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর কেউ পাননি। পাওয়া সম্ভবও নয়, কারণ খেলোয়াড় আর কোচ দুই বিভাগেই তিনি ছিলেন কিংবদন্তী। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন হাঙ্গেরির জাতীয় খেলোয়াড়। ফেরেঙ্ক পুসকাসের সব থেকে আস্থাভাজন খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। ১৯৫৪ সালে বিশ্বকাপের ফাইনালে জার্মানির কাছে হেরে যাবার পর থেকেই হাঙ্গেরির পতন শুরু হয়। প্রথমে খেলোয়াড় ও পরে কোচ হয়েও হিদেকুটি ছন্দ ফিরিয়ে আনতে পারেননি।

হাঙ্গেরির পক্ষে তিনি ৬৮ বার খেলেছেন। করেছেন ৩৯টি গোল। ১৯৫২ সালে ওলিম্পিকে সোনাজয়ী দলের সদস্যও তিনি ছিলেন। অবসর গ্রহণ করার পর তিনি প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন। শুধু দেশে নয়, বিদেশের সেরা ক্লাবগুলোর কোচ হয়ে তিনি দেখিয়েছেন স্মরণীয় কৃতিত্ব। ফুটবল খেলা শেখার ব্যাপারে তিনি বইও লিখেছেন। তাঁর সেই বই আজ ফুটবল কোচদের কাছে বাইবেলের মতো নিত্যসঙ্গী। এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগে তাঁকেই হারালো ফুটবল বিশ্ব। তবে ফুটবল খেলার ইতিহাসের পাতায় নানদোর হিদেকুটির নাম বড় বড় হরফে লেখা থাকবে।

উক্তি

পর পর দু'বার বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন চোখে নিয়ে জাপান-কোরিয়ায় খেলতে যাচ্ছি। জানি আমাদের সব থেকে বড় বাধা আর্জেনটিনা। কিন্তু বিশ্বকাপে কে যে কখন চমকে দেবে কেউ জানে না। ব্রাজিল, জার্মানিকে খাটো চোখে দেখা অত্যন্ত ভুল হবে। বিশেষ করে ব্রাজিলকে।

জিদান

(চার বছর আগে ফ্রান্সের হিরো এবারের প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে)

আমি এখনো খেলতে পারি। খেলতে চাইও। পা দুটো নিশপিশ করে। চারদিকের বাধা-নিষেধ কি আমি এড়িয়ে যেতে পারি? পারি না। আসলে আমাকে পারতে দেওয়াও হবে না।

মারাদোনা

(বিশ্বকাপের প্রসঙ্গে নিজের কথা বলার সময়)

ডেভিড বেকহ্যামের জন্যে আমায় অপেক্ষা করতেই হবে। দরকার হলে ঝুঁকিও নেবো। ভুলে গেলে চলবে না, ও বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। প্রায় ১৪ মাস ধরে ও ইংলন্ডের নেতৃত্ব দিচ্ছে। খেলছেও নেতার মতো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও সুস্থ হয়ে উঠবে। ইংলন্ডের হাল ধরবে।

এরিকসন

(বেকহ্যামের ভাঙা পা-এর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ইংলন্ডের কোচ একথা বলেন)

জার্মান দল যে কারো চেয়ে কম নয় তা আমরা প্রমাণ করে দেবই। আমাদের খাটো চোখে দেখলে ভুল হবে। খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে জানি।

ভয়লার

(নিজের দল সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসী জার্মান কোচের উক্তি)

লুই ফিগো, নুনো গোমস আমাদের দলের ট্রাম্প কার্ড। মনে রাখতে হবে ফিগো ফিফার বিচারে গত বছরের সেরা খেলোয়াড় ছিল। বিশ্বকাপেও সে অসাধারণ খেলবে বলে আমার বিশ্বাস।

মেয়ে কোলে সৌরভ। সঙ্গে বেবী সেন ও সুমিত সেন।

অলিভিয়েরা

(পোলান্ডের কোচ কোন কোন খেলোয়াড়ের ওপর নির্ভর করছেন সে কথা বলতে গিয়ে)

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে শান্তির জন্যে খেলা। মৈত্রীর বাতাবরণ আমরা গড়ে তুলব। ফুটবলকে কেন্দ্র করে মারকাটারি হাঙ্গামা খেলাটিরই চরম ক্ষতি করছে। আমরা দেখিয়ে দেব শান্তিপূর্ণ পরিবেশে খেলা কেমন হতে পারে।

কিম দে জুঙ্গ

(দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট নিজের দেশে আয়োজিত বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা নিয়ে বলতে গিয়ে একথা বলেন)

বড় ইচ্ছে ছিল এবারও জাতীয় দলে খেলার। আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। আমি কি খুব খারাপ খেলছি? মনে তো তা হয় না। তবু আমায় বাদ দেওয়া হলো। হতাশ হয়েছি আমি। চোখের জল তো পড়বেই।

রোমারিও

(দল থেকে বাদ পড়ার পর কাঁদতে কাঁদতে)

আমি অপেক্ষা করে আছি বিশ্বকাপের জন্যে। গতবারের সেই দুঃস্বপ্নের দিনটির (ফাইনাল) কথা ভুলে যেতে চাই। ব্রাজিলকে সকলে সমীহ করুক আমি তো চাই। দেশবাসীর প্রত্যাশা পূর্ণ করার জন্যে আমি প্রাণ দিয়ে খেলব।

রোনাল্ডো

(বিশ্বকাপের কথা বলতে গিয়ে)

একদিনের ক্রিকেটে শচীনের রান এখন এগোরো হাজারের ওপর।

মোহনবাগানের কৃতিত্ব

বাংলার ফুটবলের মান রেখেছে মোহনবাগান। এবারও তারাই জাতীয় ফুটবল লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। প্রতিযোগিতার শেষ অর্থাৎ তাদের ২২তম খেলায় গোয়ার চার্চিল ব্রাদার্সকে হারাতে পারলে তবেই মোহনবাগান জাতীয় লীগ চ্যাম্পিয়ন হতো। অন্যদিকে চার্চিল যদি কোনোরকমে খেলাটি ড্র রাখতে পারত তাহলে তারাই চ্যাম্পিয়ন হতো। মোহনবাগানকে সরে যেতে হতো দ্বিতীয় স্থানে। কিন্তু তা হয়নি। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয়েছিল গোলশূন্যভাবে। দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ খেলার ৭২ মিনিটের মাথায় মোহনবাগান খেলার একমাত্র গোলটি করে। ২২টি খেলায় মোহনবাগানের পয়েন্ট ৪৪। সমসংখ্যক খেলায় চার্চিলের সংগ্রহ ৪২ পয়েন্ট। কলকাতার অপর দল ইস্টবেঙ্গল জাতীয় লীগে পঞ্চম স্থান লাভ করেছে। আর টালিগঞ্জ অগ্রগামী বেঁচে গেছে অবনমনের হাত থেকে।

উঠছে যারা

বীরু বসু

ফুটবল অন্ত প্রাণ। ফুটবলই ওর ধ্যানজ্ঞান। ফুটবল ছাড়া আর কোনো কিছুই ভাবতে রাজী নয় বারো বছরের ছেলে সুভাষ চক্রবর্তী। ন'বছর বয়সে শুরু, বারো বছর বয়সে ও দাপিয়ে ফুটবল খেলছে। যখন যেখানে খবর পাচ্ছে সেখানেই ছুটে যাচ্ছে ফুটবল খেলতে। পায়ে বল পড়লেই গোল। এই অভ্যাসটা বাল্যকাল থেকেই ছিল সুভাষের মধ্যে। গত তিন বছরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশ নিয়ে সুভাষ গোল করেছে ষাট-টি। পুরস্কার পেয়েছে অনেক। হাওড়া জেলার কদমতলা কাঁটাপুকুর অঞ্চলে গেলেই দেখা যাবে সুভাষের ঘরভর্তি সাজানো রয়েছে ফুটবল খেলে পাওয়া যাবতীয় পুরস্কার। এ সবই সুভাষ সংগ্রহ করেছে সংগ্রাম করে। কারণ ফুটবলে সাফল্য পেতে গেলে যে কষ্ট করতে হবে এটা ও বুঝে গেছে।

সুভাষের ফুটবল খেলার আরো একটা কারণ আছে। ওরা যে পাড়ায় থাকে সেখানে বেশিরভাগ মানুষই মোহনবাগান সাপোর্টার। দু' একটি পরিবার ইস্টবেঙ্গল সমর্থক থাকলেও সংখ্যায় তা খুবই কম। ফলে এলাকাটি এখন হয়ে উঠেছে মোহনবাগানপাড়া। গড়ের মাঠে মোহন-বাগানের খেলা থাকলেই ওই অঞ্চলের বড় থেকে ছোট সকলেই মাঠে হাজির হয়। এই ঐতিহ্য বহু দিনের। ফলে বড়দের অনুসরণ করেই পাড়ার ছোটরাও এখন মোহনবাগান-প্রিয় হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি পাড়ার গর্ব হয়ে উঠেছে সুভাষ। কারণ নার্সারি ফুটবলে সর্বোচ্চ গোল করে সে সকলের নজর কেড়েছে। সকালে ঘুম ভাঙার পরে যে সংসারের অন্ন যোগাড় করতে বাবাকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়, এমন একটি সংগ্রামী পরিবার থেকে উঠে এসেছে সুভাষের মতো তরতাজা এক ফুটবলার। সমস্ত কষ্ট উপেক্ষা করে সে ফুটবলকে ভালবেসেছে। শিক্ষা নিকেতন বয়েজ হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সুভাষ। কোনো রকমে মাধ্যমিকটা পাশ করবে এটাই ওর ইচ্ছা। এর বেশি লেখাপড়া করা হয়তো ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই সে মনপ্রাণ দিয়ে ফুটবল খেলছে। বড় হয়ে সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে দেবে এটাই ওর আশা ও প্রত্যাশা।

ইতিমধ্যেই বেছে নিয়েছে ওর প্রাণের

সুভাষ চক্রবর্তী

খেলোয়াড় ব্যারেটোকে। বিদেশী হলেও ঘরোয়া ফুটবলে ব্যারেটোর খেলা নাকি ওর বেশি ভাল লাগে। মাত্র কয়েক বছরের হাতেখড়িতে সুভাষ যে ওর মনের মতো খেলোয়াড় বেছে নিতে পেরেছে তাতে ওর বাড়ির সকলেই খুশি। বাবা অজয় চক্রবর্তী, মা রীতা চক্রবর্তী, দাদু পাঁচুরাম চক্রবর্তী, ঠাকুমা করুণা চক্রবর্তী সকলেই মোহনবাগান অন্ত প্রাণ। সকলের ভালবাসা এবং প্রেরণা পেয়েই সুভাষের ফুটবলবোধ একটু একটু করে বেড়ে উঠছে।

মাত্র দু' বছর হলো নার্সারি ফুটবল খেলছে সুভাষ। তাতেই চেনা গেছে ওর জাত ও বর্ণ। এ রাজ্যের ফুটবলকর্তারা একটু নজর দিলে ওর বড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট। ফুটবলে একটা গোলই ম্যাচের ফলাফল গড়ে দিতে পারে। সে কারণেই সুভাষ গোল করতে ভালবাসে। আন্ডার হাইট টুর্নামেন্ট খেলে সুভাষ প্রচুর গোল করেছে। গত বছরে তরুণ স্পোর্টিং-এর পরিচালনায় সঞ্জীব দত্ত স্মৃতি চ্যালেঞ্জ ট্রফিতে ডাবল হ্যাট্রিক করে স্বামীজী সঙ্ঘের বিপক্ষে। প্রথম বছর নার্সারি ফুটবলে তেমনভাবে সাড়া ফেলতে না পারলেও দ্বিতীয় বছরে যথেষ্ট নজর কেড়েছে সুভাষ। লিগ এবং নক আউট মিলে এবারের নার্সারি ফুটবলে সুভাষ অনেকগুলো গোল করেছে। ওর কৃতিত্বেই হাওড়া ফ্রেন্ডস কোচিং সেন্টারটি দ্বিতীয়বার নার্সারি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হলো। প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। সেবার ফাইনালে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা স্পোর্টস অ্যাথলেটিককে হারিয়েছিল। এবারেও সেই টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে বাঘা সোম ফুটবল ইনস্টিটিউটকে হারিয়ে পুনরায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হাওড়া ফ্রেন্ডস।

ফুটবল নিয়ে ১২ বছরের কিশোর সুভাষের আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা থাকলেও ওর চলার পথ কিন্তু মসৃণ নয়। ওর কোচ শ্রীমান চক্রবর্তী (রেসোদা) মনে করেন নার্সারি ফুটবলারদের নিয়ে আই. এফ. এ.-এর কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। তার ওপর ছেলেরা একটু ভাল খেললেই বিভিন্ন ক্লাব কর্মকর্তারা ওদের নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করেন। ক্লাবে খেলার মোহে অনেক ফুটবলারই তখন কোচিং ক্যাম্প ছেড়ে দেয়। আর তখনি বিপদ দেখা দেয়। দু' এক বছর ক্লাবে খেলার পর সেই সমস্ত ক্ষুদে ফুটবলাররা হারিয়ে যায়। সুতরাং ফুটবলে যার সবে হাতেখড়ি হয়েছে সেই সুভাষের নজর যদি এখনি গড়ের মাঠে ক্লাবে খেলার দিকে ঝুঁকতে থাকে তবে ফুটবলে তার প্রাপ্তির ভাণ্ডার শূন্য হয়ে থাকবে। ওর উচিত হবে আরো কয়েক বছর কোচিং ক্যাম্পে থেকে নিজেকে তৈরি করা। বড়দের কথা মেনে চললে সুভাষ একদিন উন্নতি করবে। পূরণ হবে ওর বুকভরা আশা ও প্রত্যাশা। সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে দিতে তখন ওর কোনো বাধা থাকবে না। 'শুকতারা'র আশীর্বাদ রইলো ওর প্রতি।

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

অনেকের ধারণা যোগ করলে শরীরের ভিতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা যন্ত্রপাতি শক্ত সবল হয় আর ব্যায়াম করলে, বিশেষ করে ওজন নিয়ে ব্যায়ামে শরীরের বাইরের চাকচিক্য হয়। এটা সর্বৈব ভুল ধারণা। যাঁরা এই দুই শাখা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন একমাত্র তাঁরাই আমার কথার সত্যতা বুঝবেন। অন্যেরা অন্য জগৎটাকে ছোট করার জন্য বা আমারটা ঠিক অন্যেরটা ভুল একথা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এমন কথা বলে থাকেন। শুধু ব্যায়াম করে, বিশেষ করে ওজন নিয়ে ব্যায়াম করে সুস্থ সবল আছেন এমন লোক অনেক দেখতে পাই, যাঁরা দীর্ঘদিন বেঁচে আছেন জীবনের জয়গান গেয়ে। তেমন ব্যায়ামবীর আমিও দেখেছি, আপনারাও হয়তো দেখেছেন। বিশ্বশ্রী মনোহর আইচের কাছে ব্যায়াম হচ্ছে ধ্যান-জ্ঞান। সুস্থ সবল নীরোগ শরীরে এই অষ্টআশি বছর বয়সেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পেশী প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। উনি নিজেই বলেন আজ পর্যন্ত কোনো ওষুধ খেতে হয়নি। এমন কথা কি আর কেউ বলতে পারবেন? আর এক বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়। ওনার বয়সও বিরাশি-তিরাশি। এ দেশে ব্যায়ামে বিশেষ করে বডি বিল্ডিং-এ স্বীকৃতিটা উনিই আদায় করেছেন। প্রচণ্ড লড়াই করে দেহসৌষ্ঠব বিদ্যার পরিচিতি আদায় করে দিয়েছেন। এরকম আরও অনেক শরীরচর্চাবিদ আছেন যাঁরা সুস্থ সবল শরীরে মানুষকে বেঁচে থাকার পথ দেখাচ্ছেন। বাইরে ভেতরে সুস্থ সবল আছেন বলেই আজও তাঁরা জীবনের জয়গান গেয়ে চলেছেন। ওনারাও যোগের প্রচারক। ওনারাও বলেন ব্যায়ামে যেমন

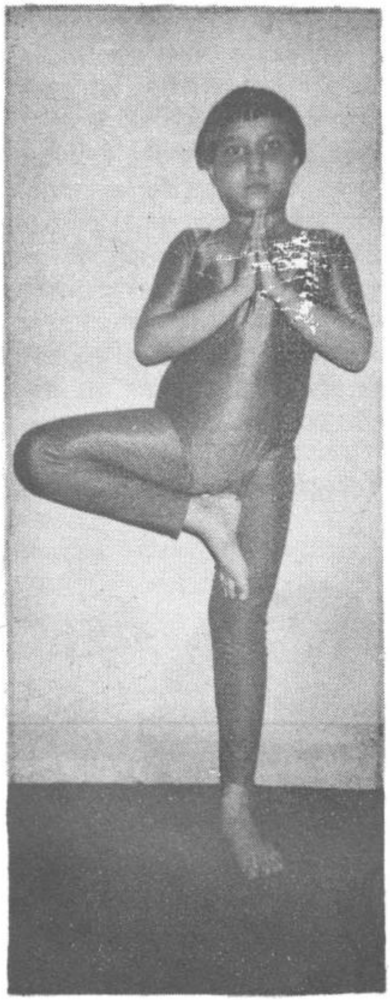

শরীরের ভেতর বাইরের উন্নতি হয় যোগেও ঠিক তেমন। তবে শারীরিক ব্যায়াম করলে আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি আর যোগ করলে ক্লান্তি দূর হয়ে যায় অচিরেই। অল্প আয়াসে শরীরের ভিতর বাইরে থাকে সুস্থ সবল। তাই যে কোনো কায়িক পরিশ্রম করার পর, যথা ওজন নিয়ে ব্যায়াম, সাঁতার, খেলাধূলা করে উঠে একটু যোগাসন করলে শরীরের ক্লান্তি দূর হয়ে ঝরঝরে হয়ে যায়। তবে আবালবৃদ্ধবনিতা শরীরচর্চা রূপ বৃক্ষের যোগ শাখার সাহায্য নিতে পারেন যেটা মেয়েদের বা বৃদ্ধ বয়সে বা অসুস্থ শরীরেও আনে সুস্থতা রূপ নদীর ধারা।

আজকের আসন **বৃক্ষাসন**—

এই আসনে শরীর ও মনের চঞ্চলতা দূর হবেই হবে। বৃক্ষ যেমন অচঞ্চল ও ঋজু সেই ভাবটাই ফুটে উঠবে নিয়মিত অভ্যাসে। বাড়বে শরীরের ভারসাম্যতা। দূর হবে পায়ের দুর্বলতা। মেয়েদের নিজস্ব অসোয়াস্তি যাবে এই আসন অনুশীলনে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডান পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে ডান পায়ের গোড়ালি বাঁ পায়ের উরুমূলে লাগাও এবং পায়ের পাতা থাকবে উরুর পাশে লাগানো ছবির মেয়েটির ন্যায়। হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে বা দু'পাশে কাঁধ বরাবর ছড়িয়ে দিতে পারো মাটির সমান্তরাল ভাবে, যেমন ভাবে বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। আসন অবস্থানে থেকে ৮/১০ বার লম্বা লম্বা ও গভীর ভাবে দম নেওয়া-ছাড়া করবে। একই ভাবে অপর পাটিকেও ভাঁজ করে একই সময়কাল থাকবে। দু'দিকে মিলে একক্ষেপ হলো। এভাবে দু'তিন ক্ষেপ অভ্যাস করবে। দুটি ক্ষেপের মাঝে শুয়ে বা বসে বিশ্রাম নেবে। পড়তে বসে মন চঞ্চল হয়ে গেলে দু'চার মিনিট এই আসনটি করে নাও, দেখবে চঞ্চলতা দূর হয়ে যাবে।

শিশু ভক্ত

অনুকূল মণ্ডল

ছোট ছেলে মিন্টুর দুরন্তপনায় মহা ফাঁপরে পড়লেন মা সুপ্রভাদেবী। বড়ো ছেলে মলয়ের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সেদিন ইংরেজি আছে। শক্ত পরীক্ষা, তাই মলয়ের মাথায় অস্থির চিন্তার তড়িৎগতি। মেজ ছেলে জ্যোতির্ময়েরও নবম শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষা চলছে। সেদিন অঙ্ক পরীক্ষা। অঙ্কভীতিগ্রস্ত সেও অঙ্ক কষতে কষতে অর্ধ-পাগল। এরিমধ্যে বড়দা ও ছোট্দাকে অনবরত বিব্রত করে চলেছে ছোটভাই মিন্টু। দুই ভাই এক ঘরে দরজা বন্ধ করে পড়ছে। ৯টা নাগাদ পরীক্ষা দিতে দুজনাই বাড়ি থেকে রওনা হবে। মিন্টুকে দু'জনাই খুব ভালোবাসে। ছোটভাই বলে কথা। আদর আর স্নেহের সম্পদ। মিন্টুর হাতের চড়-চাপ্পড় দু'ভাই যে কতো সহ্য করে তার আর ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু পরীক্ষা প্রস্তুতি-কালীন মুহূর্তে মিন্টুর দুষ্টুমিতে দু'ভাই অতিষ্ঠ বোধ করে। দু'জন ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়াতে ছোটভাই মিন্টু আরো কৌতূহলী হয়ে ওঠে। জানলায় ইটের টুকরো ছুঁড়তে থাকে। জানলা-দরজার ফাঁক-ফোকড় দিয়ে ছোট লাঠি ঢুকিয়ে হাঁকাহাঁকি হৈ-হুল্লোড় করতে থাকে। মা প্রচণ্ড অস্বস্তিবোধ করেন। রান্না চাপানো। দুইজন পরীক্ষার্থী ছেলের খাবার তৈরি করে দিতে হবে। হাতে মাত্র আধঘণ্টা সময়। মা সুপ্রভাদেবী হেঁকে বলেন, বাবা, আজকের দিনটা একটু শান্ত হ। কথা শোন বাবা।

কার কথা কে শোনে! আরো বজ্জাতি শুরু করে। মা ছুটে মিন্টুকে ধরে মারতে গিয়ে থমকে যান। ওকে আঘাত করলে আগুন, ভালোবাসলে ফাগুন—হি-হি করে প্রাণখোলা হাসে। কোলে টেনে আদর করলে, গায়ে মাথায় হাত বুলালে যেন সুবোধ বালকটি। কিন্তু আজ সে সময় কই। মা সুপ্রভাদেবী হঠাৎ এক অভিনব বুদ্ধি মাথায় আনলেন। মিন্টুকে কিছু নরম মাটি তুলে দিয়ে বললেন, তুই দেবদেবীর মূর্তি তৈরি কর দেখি। ভালো হলে তোর বাবা এলে পুজো করা যাবে। তোর বাবার তো আজ বাড়ি আসার কথা।

মিন্টুর উদ্দাম গতি মুহূর্তে থেমে যায়। ছটফটানি, দৌড়ঝাঁপ, দাদাদের পড়ার ঘরে হামলা সব বন্ধ হয়ে যায়। নরম মাটির তাল নিয়ে ঠাকুর তৈরির কাজে লেগে যায়। ছোট্ট তক্তা ও ইটের টুকরো সংগ্রহ করে নেয়। বাবার সাজানো তক্তা ও ইটের সারি নেড়েচেড়ে তছনছ করে। তবু মা নীরব থাকেন। অনেকটা স্বস্তি, অনেকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচার রাস্তা তো বেরিয়েছে। ওর দাদারা পড়তে পারছে, রান্না মনোযোগ দিয়ে করতে পারা যাচ্ছে—এসব কি কম পাওনা!

মিন্টু গলা ছেড়ে হাঁক জোড়ে, ওমা, কী ঠাকুর বানাবো?

কেন তোর পড়ার বাক্সে তো তুই অনেক দেবদেবীর ছবি রেখেছিস। যে দেবদেবী তোর ভালো লাগে সেটি সুতো দিয়ে টাঙিয়ে দেখে দেখে মূর্তি তৈরি কর—রান্নার ব্যস্ততার মধ্যে সুপ্রভাদেবী উত্তর করলেন।

মিন্টু মায়ের কথায় সম্মতি জানিয়ে ছুটে গিয়ে বাক্স থেকে একটি ছবি বের করে এনে ছোট্ট নারকেলের কাঠি দিয়ে ছিদ্র করে তাতে সিমেন্টের বস্তার সুতো দিয়ে পেয়ারা গাছের ডালে বেঁধে দেয়। তারপর

পেয়ারা গাছের নিচে বসে একমনে মূর্তি করার কাজে লেগে যায়। এরি মাঝখানে ওর দুই দাদা স্নান করে, খাওয়াদাওয়া সেরে রওনা দিতে তৈরি হয়। মা মিন্টুকে বলেন, কই মিন্টু, তুই হাত-পা ধুয়ে আয়। দাদাদের প্রণাম নিবি না?

পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় মিন্টু দাদাদের প্রণাম আদায় করে নেয়। প্রথম দিন মিন্টু বলেছিল, এই দাদারা, আমাকে প্রণাম করে যাবি। নতুবা পরীক্ষা ভালো হবে না। মা সুপ্রভাদেবী হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তুই সাত-আট বছরের বাচ্চা ছেলে। তোকে আবার কী প্রণাম করবে রে! তোর দাদারা ও আমরা হচ্ছি গুরুজন। তুই তো আমাদের প্রণাম করবি। মিন্টু তৎক্ষণাৎ উত্তর করেছিল, কেন তুমি যে বলেছিলে শিশুরা সরল, ওদের দেহের মধ্যে ভগবান থাকেন। তাহলে আমাকে প্রণাম করলে কী ভগবানকে প্রণাম করা হয় না? আমি তো এখানে-ওখানে যাওয়ার সময় তোমাদের কথামতো প্রণাম করে যাই। তাহলে আমার কথা শুনবে না কেন?

মিন্টুর কথার কেউ পাল্টা উত্তর খুঁজতে না গিয়ে দুই দাদা পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় মিন্টুর পায়ে হাতটা ঠেকিয়ে নিজেদের মাথায় ছোঁয়ায়। মিন্টু বলে, যা, যা, পরীক্ষা ভালো হবে। তারপর নির্মল হাসিতে মুখ ভরিয়ে ভাইদের দিকে তাকায়। তবে প্রণাম নেওয়ার জন্য মিন্টু কিন্তু হাত-পা পুকুরঘাট থেকে ধুয়ে শান্ত হয়ে প্রতিমার মতো স্থির হয়ে দাঁড়ায়। দুই দাদা তখনই তার পায়ে হাত স্পর্শ করে নিজেদের মাথায় ঠেকায়। কিন্তু সেদিন মিন্টু বলে, আজ তো অতো সময় নেই, প্রতিমা তৈরি করছি। মন নড়ে যাবে। প্রতিমা ভালো হবে না। মা তো বলেছে পড়াশুনা একমনে না করে অন্যদিকে মন দিলে মন নড়ে যায়। পড়াশুনা ভালো হয় না। তাই প্রতিমা গড়ার সময় মন নড়ে গেলে প্রতিমা ভালো হবে না।

চমৎকার কথা। মা ও দুই দাদা বিস্ময় বোধ করে। মা সুপ্রভাদেবী বলেন, তোদের ছোটভাই এখন একমনে দেবতা হয়েছে, প্রণাম করে পরীক্ষা দিতে যা। পরীক্ষা ভালো হবে। দুই দাদা পূর্বের ন্যায় প্রণাম করে একে একে জিজ্ঞাসা করে, পরীক্ষা ভালো হবে তো? মিন্টু বলে, দেখবি, ভালো হবে। ঠিক ভালো হবে। দুজন পরীক্ষা দিতে গেলে কিছুক্ষণ বাদে মিন্টুদের লোহার গেটে ধাক্কা পড়তেই মিন্টু দরজার দিকে তাকালো। তাকাতেই ওর বাবার উপস্থিতি চোখে পড়লো। এক নিমেষে লাফাতে লাফাতে দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার জুড়লো, মা ঠিক বলেছিল বাবা আসবে। আমিও তাই মনে করেছিলাম। ও মা দেখো, দেখো, বাবা এসেছে!

সুপ্রভাদেবী পুকুরঘাটে হাত-পা ধুচ্ছিলেন। 'হ্যাঁ আসি', বলে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন। মিন্টু সেই কাদা হাতে বাবার হাত ধরে সে কী নাচানাচি! বাবা, সরস্বতী বানিয়েছি। দেখো দেখো। হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল প্রতিমার কাছে। বাবা অনিন্দ্যবাবু তো অবাক।

বারে চমৎকার প্রতিমা তো! স্ত্রী সুপ্রভাদেবীকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রতিমা কে বানিয়ে দিয়েছে গো? মিন্টু না অন্য কেউ? সুপ্রভাদেবী এগিয়ে এসে প্রতিমা দেখে তো অবাক। সত্যি তো! ভালো প্রতিমা হয়েছে। আরে মিন্টু তুই এতো সুন্দর প্রতিমা বানালি কী করে!

একমনে করেছি মা। বলেই মিন্টু বায়না ধরলো, বাবা, পুজো করতে হবে। চলো ফল-টল কিনে আনি। অনিন্দ্যবাবু বললেন, একটু ধৈর্য ধর বাবা। একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। তারপর দুপুরে দুটো খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে দু'জন বাজারে গিয়ে তোর বায়না মতো সব কিনে আনবো। তুমি কী বলো? মিন্টু ও অনিন্দ্যবাবুর হাবভাব দেখে সুপ্রভাদেবী পুজোয় সম্মতি জানাতে বাধ্য হলেন।

অনিন্দ্যবাবু পুকুরঘাটে মিন্টুকে নিয়ে ওর এবং নিজের হাতমুখ ধুয়ে বেঞ্চে বসে বলেন, ভালোই হয়েছে। শুক্লপক্ষ, ঝলমলে চাঁদের আলো। বৈশাখ মাস। সকালেই পঞ্জিকায় দেখলাম অমৃতযোগ চলছে। পুজোর শুভ সময়। অসুবিধা নেই। পুজো করা যাবে। বাবার কথা শুনে মিন্টু দু' হাতে তালি দিয়ে নাচতে থাকে আর বলতে থাকে, ওমা পুজো হবে। বিকেলে বাজারে যাবো বাবার সঙ্গে। কতো কী কিনে আনবো।

অনিন্দ্যবাবু বললেন, শোনো মিন্টু, ছোট্ট মানুষের ছোট্ট পুজো। কয়েকটা ফল কিনবো। আর ধূপ ধুনো নিয়ে কয়েকটা জিনিস কিনবো। তুমি যতো শান্ত, ভদ্র হবে, যতো আমার কথা মেনে চলবে ততো সহজে সুন্দর করে পুজো করা যাবে। এখন চলো, শান্ত মনে স্নান করে খেয়ে নিই। নতুবা সব গোলমাল হয়ে যাবে। পুজো ভালো হবে না। ভগবান রেগে যাবেন। বাবার কথা শুনে মিন্টু খুব শান্ত হয়ে বাবার কাছে বসে মাথায় তেল মেখে নেয়। অনিন্দ্যবাবু সুপ্রভাদেবীকে বলেন, দেখেছো তো, মিন্টু কতো সুন্দর কথা শোনে। আসলে তোমরা তো ওকে বকাঝকা করো, মারো। তাই ও রেগে যায়, দুষ্টুমি করে।

সুপ্রভাদেবী উত্তর দেন, কথা শুনলে, পড়াশুনা করলে ওকে কি জন্য মারবো? অনিন্দ্যবাবু বলেন, শুনলে তো মিন্টু, তাহলে কথা শুনে চলবে তো? পড়াশুনা নিয়মিত করবে তো? তোমার দাদারা কথা শুনে চলে বলে তো ভালো লেখাপড়া শিখতে পারছে। মিন্টু বলে, ঠিক আছে, মার কথা শুনবো, পড়বো। অনিন্দ্য মিন্টুকে নিয়ে স্নান করে আসেন। অনিন্দ্যবাবু মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। দূরের এক স্কুলে কাজ করেন। সেখানেই থাকেন। কালেভদ্রে বাড়ি আসেন। অনেকদিন পরে বাড়ি এলে মিন্টু কাছছাড়া হতে চায় না। কতো গল্প! কতো না বায়না! জামা, প্যান্ট, জুতো, বই, খাতা, কলম, রং পেন্সিল—কতো কী ই না কিনে দিতে হয় বাবাকে। এবার ধরেছে পুজোর বায়না।

বাপবেটায় খেতে বসে। সুপ্রভাদেবী বলেন, বাঃ ছেলের বাবার সঙ্গে কতো ভাব। মিন্টু এখন সত্যি তো ভগবানের ভক্ত। দেখি পুজোর পরে যদি মন শান্ত হয়, দুরন্তপনা কমে তবে বাঁচি। বাব্বা আমি আর সামলাতে পারিনে। নিজে পড়তে চায় না, ভাইদের পড়ার সময় কী বজ্জাতিই না করে! মিন্টু বলে, দেখো সরস্বতী পুজোর পর অনেকক্ষণ ধরে পড়বো। অনিন্দ্যবাবু বলেন, বাবা, না পড়লে সরস্বতী দেবী রেগে গিয়ে কী শাস্তি দেবে বলা যায় না। আমাদের লেখাপড়ার দেবী কিন্তু সরস্বতী। মিন্টু ভয়ে ভয়ে বলে, সত্যি বাবা, পড়বো। সত্যি পড়বো।

খাওয়া শেষ হলে দু'জনে একটু বিছানায় গড়িয়ে নেয়। তারপর মিন্টু পুজোর বাজার সারতে বারবার বাবাকে অতিষ্ঠ করতে থাকলে অনিন্দ্যবাবু বলেন, আনো দেখি কলম-কাগজ। কী কী জিনিস আনতে হবে তার একটি ফর্দ করো দেখি। মিন্টু ছুটে কাগজ-কলম আনে। অনিন্দ্যবাবু লিখতে বলেন। বাতাসা-৫০, নকুলদানা-৫০, কমলা-২টি, আপেল-২টি, শসা-২টি, কলা-২টি,

ধূপ-ধুনো ইত্যাদি। মিন্টু লিখে যায়। বানান শেখা হয়, সংখ্যা শেখা হয়, যত্ন করে লেখাতে হাতের লেখা ভালো হয়।

মিন্টুর অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক বায়না, অনেক তাড়াহুড়ার মধ্যে বাবা ছেলের মনের ইচ্ছে পূরণ করে আরো ২/১টি জিনিস বেশি কিনে পুজোর বাজার সারলেন। বৈশাখের পূর্ণিমা, পরিষ্কার আকাশ। চাঁদের আলোয় ঝলমলে পরিবেশ। সরস্বতী প্রতিমার মৃৎশিল্পী সাত-আট বছরের ছেলে মিন্টু। পূজারী বাবা অনিন্দ্যবাবু শিক্ষক। বাজার থেকে 'ঘরোয়া পূজার্চনা' নামে একখানা বইও কিনে ফেললেন তিনি। বাপ-বেটায় বাড়ি এলেন। আজকে হাত-পা-মুখ ধোয়ায় সাহায্য করতে হলো না মিন্টুকে। একাই কাজ সেরে ঘরে ঢুকলো। মায়ের স্থায়ী নির্দেশ সকলের জন্য বাইরে বেরুলে কেউ হাত-পা-মুখ না ধুয়ে ঘরে উঠবে না।

মিন্টু ব্যস্ত হয়ে বললো, বাবা, কী কী গোছাতে হবে? দূর্বা, ফুল, বেলপাতা, আমের পল্লব, আর কী...? মিন্টুর ছটফটানি দেখে অনিন্দ্যবাবু তাড়াতাড়ি হাত-পা ধুয়ে বাজারের জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখলেন।

সামান্য সময় আর নষ্ট করলেন না অনিন্দ্যবাবু। কয়েকখানা কলার পাতা কেটে ধুয়ে চৌকির উপর রাখতেই চোখের নিমেষে এসে গেল দূর্বা, বেলপাতা, ঘরের সামনে লাগানো বিভিন্ন রকমের জবা, কাঞ্চন, গন্ধরাজ, মাধবীলতা ইত্যাদি ফুল। মিন্টুকে এবার সামলাতে চাইলেন অনিন্দ্যবাবু। উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। ঝটিকাবেগে পা ফেলা দেখে অনিন্দ্যবাবু ভাবলেন—বিপদ ঘটতে পারে। তিনি সাবধান করলেন, দেখো মিন্টু, তুমি যেভাবে চলাফেরা করছো তাতে বিপদ ঘটতে পারে। সাপ, পোকামাকড় কামড়ে দিতে পারে। তুমি চুপ করে মন স্থির করে সরস্বতীর কথা একমনে ভাবো। কথা না শুনলে কিন্তু আমি পুজো করবো না। তিনি একখানা আসনও পেতে দিলেন মিন্টুর জন্য। সত্যি সত্যি মিন্টু চুপচাপ বসে পড়লো। একেবারে নীরব; ধীর স্থির। ওর বড়দা মলয়, ছোটদা জ্যোতির্ময়কে ডেকে বাকি সব প্রসাদগুলো কেটেকুটে গুছিয়ে নিল। ইতিমধ্যে মিন্টু আবার উঠে গিয়ে মুহূর্তে প্রদীপ, ঘণ্টা, কোশাকুশি, চন্দন পাটা, পাথরবাটি, শাঁখ, ধুনচি নিয়ে এসে বললো, বাবা, কই তোমাদের তো এসব জিনিসের কথা মনে হয়নি। দেখো, দেখো আরো কতো পুজোর জিনিস এনেছি।

অবাক হলেন অনিন্দ্যবাবু। এতক্ষণ মিন্টু নীরব থেকে কী এসব ভাবছিল! কী সুন্দর মনের একাগ্রতা! এবার সবাইকে নিয়ে পুজোর বাকি ছোটখাটো প্রস্তুতি সেরে নিলেন তিনি। পুজোর সময় সুপ্রভাদেবী মিন্টুর বড়দা আর ছোট্‌দাকে মিন্টুর চাপে পড়ে ডেকে বসালেন সরস্বতীর সামনে। 'ঘরোয়া পূজার্চনা' বইটি অবলম্বন করে সুপ্রভাদেবীর পরামর্শমতো পুজোর কাজ সারলেন। দাদারা এলোমেলো বকতে চাইলে মিন্টু বাধা দিয়ে বলে, এই দাদা, পুজোর সময় কথা বলতে নেই। সরস্বতী রাগ করবে, ক্ষতি করবে, লেখাপড়া হবে না।

দাদারা শান্ত হয়ে বলে, বাব্বারে, সরস্বতীর বড়ো ভক্ত যে। অনিন্দ্যবাবু বলেন,

মিন্টু ঠিক বলেছে। ভক্তি না থাকলে কিছুই পাওয়া যায় না। দেখো তোমাদের চেয়ে মিন্টুর ভালো লেখাপড়া হবে। অনিন্দ্যবাবু এবার মিন্টুর হাতে প্রসাদ তুলে দিয়ে খেতে বললে মিন্টু বলে, না, না, বাবা, সবাইকে দিয়ে তবে আমাকে খেতে হয়। এটা তো আমার পুজো। মিন্টু করলোও তাই, বাবা প্রসাদ দিলে ছুটে ছুটে মা ও দুই দাদা প্রত্যেকের মুখে একটি করে প্রসাদের টুকরো গুঁজে দিলো। বাবাকেও দিতে ছাড়লো না। সবার মুখে সে কী প্রশান্তির হাসি। মিন্টুর মুখেও। এরচেয়ে শুদ্ধ মনে, সুন্দর একাগ্র চিত্তের পুজো আর কী হতে পারে।

সবকিছু সুন্দর হলো। সবকিছু সামলানো গেল। কিন্তু সমস্যা বাধলো পাশের বাড়ির পিসিমা, নমিতা দিদি, মেসোমশায়, মাসিমা এবং ওদের দু'জন মেয়ে বড়ো মাম ও কচি মামকে প্রসাদ দেওয়া নিয়ে। মিন্টু দাদাদের প্রসাদ দিয়ে আসতে বললো। তারা রাজী হলো না। মিন্টু নিজে যেতে চাইলো। কিন্তু পথে কুকুর, বিড়াল নিয়ে নানা আপদ-বিপদের কথা ভেবে যেতে দিতে চাইলেন না অনিন্দ্যবাবু। বড়দা, ছোট্‌দা তামাশা করে বললো, ওই আবার পুজো হলো! ছেলেমানুষির ছেলেখেলার পুজোর প্রসাদ আবার বিলোতে হবে! সুপ্রভাদেবীও দুই দাদাকে যেতে জোর করলেন না। ক্ষোভে দুঃখে মিন্টু কেঁদেই ফেললো। বাবা অনিন্দ্যবাবু মনে অসম্ভব ব্যথা পেয়ে বললেন, শিশুর সরল নির্মল মনের ঈশ্বর-ভক্তি এভাবে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে নষ্ট করো না। অনিন্দ্যবাবু মিন্টুর মনের আনন্দ খুঁজতে, রাগ কমাতে, মুখে হাসি ফোটাতে নিজেই পৃথক পৃথক পাত্রে প্রসাদ তুলে সবার বাড়িতে দিয়ে এলেন। সবাই শুনে তো মহাখুশি। মিন্টুর ঈশ্বর-ভক্তির প্রশংসা করে ওর মঙ্গল প্রার্থনা করলেন।

বাড়ি ফিরে অনিন্দ্যবাবু দেখলেন দুই ছেলে প্রসাদ বিতরণ নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক বসিয়েছে। তাতে সম্মান-অসম্মানের প্রশ্ন তুলে এবং পুজোর তুচ্ছতা নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে। মিন্টু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অনিন্দ্যবাবু আত্মসম্বিৎ হারালেন। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে চৌচির হলেন। নীরবে জামাপ্যান্ট পরে গৃহত্যাগ করতে যাবেন এমন সময় মিন্টু বাবাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে বললো, বাবা তুমি চলে গেলে আমি মরে যাবো, ঠিক মরে যাবো। মিন্টুর চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে অনিন্দ্যবাবু ভাবলেন—এ আমি কী করছি! মিন্টুর ঈশ্বরের ভক্তি নষ্ট হবে। পুজো করার অর্থ অঘটন, অশান্তি, বিচ্ছেদ, দুঃখ, দুর্দশা—এসব যদি মিন্টু মনে করে তবে শিশুমনের গঠনই নষ্ট হবে।

মিন্টুকে কোলে তুলে অনিন্দ্যবাবু নিজের চোখের ও মিন্টুর চোখের জল মুছে বলেন, বুঝলে মিন্টু, ওদের মনে ভক্তি জাগেনি। মায়ের ভক্তি সবার মনে জাগে না রে। তাহলে তো সবাই রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ হতে পারতো। তুমি মনে ভক্তি জাগাতে পেরেছো বাবা। তুমি অনেক বড়ো হবে। অনেক অনেক লেখাপড়া শিখতে পারবে। তুমি কিচ্ছু মনে করো না বাবা, ওরা যা পারে করুক। এবার ওকে কোল থেকে নামিয়ে একটি পাত্রে প্রসাদ তুলে ওকে পাশে বসিয়ে খাওয়াতে থাকেন। মলয় ও জ্যোতির্ময় ওদের কাছে এসে বললো, মিন্টুকে একটু রাগাচ্ছিলাম। দেখছিলাম মিন্টুর ভক্তি কতোটা। মিন্টু বলে—যা তোদের কারো সঙ্গে কথা বলবো না। সুপ্রভাদেবী মিন্টুকে কোলে তুলে ওর মুখে প্রসাদ গুঁজে দিয়ে বলেন—আমার শিশু ভক্তের কাছে দুই দাদা হেরে গিয়েছে। তোর মঙ্গল হবে। তোর ভালো হবে বাবা। তোর দেবদেবীর ভক্তিতে আমি অবাক হয়েছি।

ছবি : রঞ্জন দত্ত

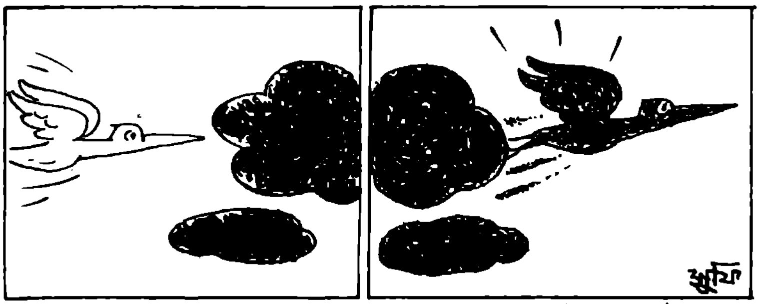

দেব সাহিত্য কুটীরের অভিধান

Students' Favourite Dictionary
(Eng. to Beng.) 180.00

Students' Favourite Dictionary
(Beng. to Eng.) 140.00

Dev's Concise Dictionary
(Eng. to Beng.) 95.00

Dev's Concise Dictionary
(Beng. to Eng.) 85.00

Pocket Dictionary
(Eng. to Beng.) 75.00

Pocket Dictionary
(Beng. to Eng.) 60.00

Midget Dictionary
(Eng. to Beng.) 22.00

Midget Dictionary
(Beng. to Eng.) 20.00

শব্দবোধ অভিধান ১৫০.০০

সরল অভিধান ৫০.০০

নববিধান ৮৫.০০

সুবল মিত্রের

The Students' Constant Companion 125.00

☆ পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড

২১, ঝামাপুকুর লেন ◆ কলকাতা-৭০০ ০০৯

কাপালিকেরা আজও নরবলি দেয়

রণেন বসু

হেমন্তের ঘুম হঠাৎই ভেঙে গেল। কী একটা ডেকে উঠলো! ঘুম ভাঙার পর 'কোঁকর কোঁ-ও-ও' ডাকটা আবার ভেসে আসে। আগে কখনও এ ডাক সে শোনেনি। এই প্রথম শুনলো। ভয়ে ভয়ে সে চোখ মেলে তাকাতেই দেখতে পেল ভোরের আলোয় ঘর ভরে গেছে।

চোখ মেলেই সে কিন্তু অবাক হলো! কোথায় সে শুয়ে আছে? সব কিছুই তার অপরিচিত লাগলো! সে চারদিকে চেয়ে দেখতে থাকে। কচি কলাপাতা রঙে কাঠের সব ঘর। ভারী ভারী পর্দা ফেলা বড় বড় জানালা। দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় ছবি। অবশ্য সবগুলোই বনের পশুপাখির বিভিন্ন রঙিন ফটোগ্রাফ বাঁধিয়ে টাঙানো আছে।

ধীরে ধীরে তার মনে পড়ে, গতকাল বেশ রাতে তারা প্রিয়কাকুর বাংলোয় এসে উঠেছে। প্রিয়কাকু বন দপ্তরের উঁচু পদস্থ কর্মচারী। এবারের পুজোর ছুটিতে তারা বন দেখবে বলেই এখানে এসেছে। দীর্ঘপথ জীপে পাড়ি দিয়ে যখন এসে পৌঁছেছিল তখন তার দুই চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসছিল।

কোঁকর কোঁ-ও-ও, আবার ডাকটা ভেসে আসতেই পাশ থেকে মায়ের গলা শুনতে পেল, 'মোরগ ডাকছে, ভোরের খবর মোরগই সবার আগে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়।'

'মোরগ ডাকছে! আমি দেখবো।' বলেই সে লাফিয়ে মশারির বাইরে বেরিয়ে একছুটে দরজা খুলে বারান্দায় আসতেই এক বর্ণ ও ছন্দময় বিস্ময়কর জগৎ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গভীর বনের মধ্যে ভোরের দৃশ্য যে এত সুন্দর তা তার কল্পনার বাইরে ছিল। এখানে না আসলে এ স্বর্গীয় জগৎ তার কল্পনার বাইরেই থেকে যেত।

বেশ কিছু জায়গা জুড়ে বন দপ্তরের কলোনি। দশ-বারোটা ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। প্রিয়কাকুর বাংলোটা সবচেয়ে বড় এবং খুব সুন্দর। লন পুরু ঘাসের কার্পেটে ঢাকা, শিশির পড়ে ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে আছে। শিশিরভেজা ঘাসের মধ্যে পায়ের পাতা ডুবে যেতেই সারা শরীরে এক অপূর্ব শিহরন জাগে। সে ছুটে চলে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

চারদিকে গভীর বনের নিচে তখনও জমাট বাঁধা অন্ধকার কাটেনি কিন্তু গাছের মাথায় মাথায় সোনালী রোদের ঝর্ণাধারা বয়ে চলেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে নবারুণ আলোর রামধনুর বুকে প্রজাপতিরা ডানা মেলে উড়ে উড়ে গিয়ে বসছে ফুলদলের ওপর। তাদের ভারে নুয়ে পড়ছে ফুলেরা। প্রিয়কাকুর বাংলোর সামনেই শিউলির ঝাড়। নিচে ঘাসের মাথায় মাথায় অসংখ্য শিশিরবিন্দু মুক্তোর মতো জ্বলছে, তাতে ছড়িয়ে রয়েছে শিউলি ফুল। তার সুবাস চারদিকে।

এক ঝাঁক টিয়া হঠাৎ লনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই উড়ে গেল। হয়তো তাকে দেখে ভয় পেয়েছে।

'হোমস খেতে এসো, আমরা তোমার জন্যে বসে আছি।' মায়ের ডাকে সে বারান্দা পেরিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকতে দেখতে পেল, সবাই টেবিল ঘিরে বসে। এক নেপালী মহিলা হাতে হাতে সব কিছু এগিয়ে দিচ্ছেন, মুখে তাঁর মিষ্টি হাসি। বাবা-মার সঙ্গে প্রিয়কাকু আছেন, তিনিই গতকাল তাদের আনতে স্টেশনে গিয়েছিলেন। আর আছেন মার বয়েসই আরেক মহিলা, তিনি ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'কাল রাতে তো ঘুমের মধ্যে দুধটুকু ছাড়া আর কিছু খেলে না, এসো কিছু খেয়ে নাও।'

'হোমস ইনি তোমার নতুন কাকী।' তারপর সেই নেপালী মহিলাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওঁকে আন্টি বলে ডাকবে।' শুনে মহিলা ওর দিকে মিষ্টি করে হাসলেন।

সে মাথা নিচু করে নতুন কাকীকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি হাত ধরে ফেলে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। খাবারের প্লেট এগিয়ে ধরে মার দিকে চেয়ে জানতে চাইলেন, 'ওর নাম হোমস কেন? নামটার মধ্যে বেশ নতুনত্ব আছে।'

'আর বলেন কেন, ওর বাবা শার্লক হোমসের ভক্ত। তাই ছেলের নামও ওঁর সেই আদর্শ পুরুষের নামেই রেখেছেন। আমি অবশ্য একটা অন্য নাম রাখার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ধোপে টেকেনি।'

শুনে সবাই হেসে ওঠে। তারপরেই প্রিয়কাকু জানতে চাইলেন, 'তোমার কেমন লাগছে হোমস? অবশ্য এখানে দেখার মতো বিশেষ কিছু নেই। শুধু গাছ আর গাছ। তবে কিছু খরগোশ আর হরিণের দেখা পেতে পারো। পাখিও আছে প্রচুর। মাঝে মাঝেই ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসে বুনো হাতির দল। বাঘও যে দু'চারটে নেই তা নয়।' শেষের কথাগুলো হোমসের বাবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'চা-বাগান আর পাহাড়ী নদীগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর।' তারপর সিগারেট ধরিয়ে, 'এর' মধ্যে একদিন জলদাপাড়ায় গিয়ে হাতির পিঠে চড়ে আসবো, বুঝলে হোমস। হাতির পিঠে বসে বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে গণ্ডার খোঁজার মধ্যে একটা আলাদা থ্রিল আছে। সময় মতো সব কিছুই ঘুরে ঘুরে দেখা যাবে। তুমি কিন্তু একা একা বনের মধ্যে ঢুকতে যেও না। বনের মধ্যে পথ হারানোর সম্ভাবনা খুব বেশি।'

ঠিক সেই সময় আট/নয় বছরের এক নেপালী মেয়ে ঘরে ঢোকে, হাতে ফুলের বড়সড় একটা তোড়া। অপরিচিতদের দেখে সে থমকে দাঁড়ায়।

'বাঃ তোমাকে তো ফুলের পাশে খুব সুন্দর লাগছে। চমৎকার সাবজেক্ট। দাঁড়াও তোমার একটা ফটো তুলে নিই।' বলেই হোমসের বাবা ক্যামেরা তুলে নিলেন। মেয়েটা লজ্জা পেয়ে নতুন কাকীর আড়ালে সরে গেল।

কাকী হেসে বললেন, 'কিরে লজ্জা কিসের!' তারপর মার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই পরমা আছে বলেই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এখনও বেঁচেবর্তে আছি। ও আমাদের মালির মেয়ে, সারাদিন আমার কাছেই থাকে। প্রতিদিন ফুলের যোগান দেয়।'

হোমসের ততক্ষণে খাওয়া হয়ে গেছে। সে বাইরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তা লক্ষ্য করে প্রিয়কাকু বললেন, 'তুমি বরং পরমার সঙ্গে গিয়ে বুনো হাতির বাচ্চাটাকে দেখে এসো, গতকালই ধরা পড়েছে।' শুনে হোমস তো মহাখুশি। সে উঠে পড়ে। কাকী পরমার হাতে একটা কেকের টুকরো দিয়ে বললেন, 'যাও পিলখানাটা দেখিয়ে আনো।'

বন-দপ্তরের পিলখানায় দুটো মাত্র পোষমানা হাতি। তাদের সামনে ডাঁই করা কলাগাছ। সামান্য দূরে খুঁটিতে বাঁধা ছোট্ট একটা বাচ্চা হাতি। শুঁড় না থাকলে মোটাসোটা শুয়োর বলেই মনে হয়। খুঁটির চারদিকে বেশ কয়েক পাক ঘুরিয়ে তাকে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। দুধ খাওয়ানোর দৃশ্যটা বেশ মজার। বিরাট ফিডিং বোতলে প্রায় দুই লিটার দুধ। মানুষের বাচ্চার মতো বাচ্চা হাতিটা দুধ খাচ্ছিল। গায়ে তার তখনও খাড়া খাড়া খয়েরি রঙের বড় বড় লোম।

'কাল সবেরে কিট্টুদা পাকড়ায়া।' যে লোকটি দুধ খাওয়াচ্ছিল তাকে দেখিয়ে পরমা বললো। শুনে হোমসের মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। বেচারা মা-হারা হয়ে গেল। আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের ক্রীতদাস হতে চলেছে সে। লোকটা স্নেহভরে দুধ খাওয়ালেও হোমসের তাকে পছন্দ হলো না। তার খুব ইচ্ছে করছিল বাচ্চাটার গায়ে হাত দিয়ে আদর করে।

সারা দুপুরটা হোমস ঘরে থাকতে বাধ্য হলো। গভীর বনের মধ্যে দুপুরের নির্জনতা যেন চারদিক থেকে গ্রাস করতে চাইছে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। এই প্রথম হোমস বুঝতে পারে, প্রচণ্ড শব্দ যেমন কানে তালা লাগায় তেমনি গভীর নিস্তব্ধতা মনের মধ্যে এক ঝিমভাব আনে। মাঝেমাঝে দু'একটা ঘুঘুর ডাক ভেসে আসে। নির্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাক নিস্তব্ধতাকে আরো যেন ভয়ঙ্কর নিঃস্ব করে তোলে।

মা, কাকী যে যার মতো ঘুমিয়ে আছে। আন্টিও বাড়ি নেই। ওনার বাড়িতে গেছেন মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে, বিকেলেই ফিরবেন। প্রিয়কাকু জীপ নিয়ে জলপাইগুড়ি গেছেন অফিসের কাজে, সঙ্গে বাবাও গেছেন। ঘুমন্ত বাড়ির নিস্তব্ধতা তার আর এক মুহূর্ত ভাল লাগছিল না। বারবার মনে পড়ছিল সদ্য ধরা পড়া বাচ্চা হাতিটার কথা। বাবা-মার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুর কী করুণ অসহায় চোখ জোড়া। তাকে আর একবার দেখে আসতে ইচ্ছে হলো তার। নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে আসতেই চোখে পড়ে অপরাহ্ণের বনানীর আর এক রূপ। সে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে সেদিকে।

হঠাৎ তার নজরে পড়ে, সাদা ধবধবে খরগোশটার দিকে। কিসের তাড়া খেয়ে সবুজ লনের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে বারান্দার সিঁড়িতে উঠে আসতে আসতে তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপরেই নিচে লাফিয়ে পড়ে একটা ঝোপের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে। হোমসও ছুটে নেমে আসে লনে। হয়তো তারই পায়ের শব্দে খরগোশটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে আর একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেও তাকে অনুসরণ করে ঝোপের মধ্যে ঢুকতে দেখতে পেল পরমা সেখানে কী যেন খুঁজছে। তাকে দেখে পরমা ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে শব্দ করতে নিষেধ করলো। সে বুঝতে পারলো পরমাও খরগোশটাকেই খুঁজছে। ঠিক সেই সময় খরগোশটা বেরিয়ে লম্বা একটা দৌড় মেরে বেশ দূরের একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ওরাও ছুটে যায় কিন্তু পায় না।

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল খরগোশটা একটু দূরে অন্য একটা ঝোপের কাছে। ওরাও হৈ হৈ করে ছুটে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তে সেটা উধাও।

'উধার উধার', বলে পরমা আরও দূরের ঝোপের দিকে ছুটে যায়। যদিও

হোমস এবারে দেখেনি তবুও পরমার সঙ্গে সঙ্গে সেও ছুটে গেল। কিন্তু সেখানে নেই। চলতে থাকে খরগোশ ও তাদের মধ্যে চোর-পুলিশের খেলা। খেলায় অবশ্য খরগোশেরই জয় হলো। সে কোথায় যে লুকালো তা ওরা আর জানতে পারলো না। হাল ছেড়ে, ক্লান্ত শরীরে দু'জনে হাঁপাতে থাকে।

কখন যে দিনের আলো কমে এসেছে দু'জনে খেয়ালই করেনি। বনের ভিতর অন্ধকার নামে বেশ তাড়াতাড়ি। দেখতে দেখতে বিশাল বিশাল গাছের নিচে আঁধার জমে ওঠে। হোমস-পরমা ঘরে ফেরার জন্য ছটফটিয়ে ওঠে।

'এই চলো ফেরা যাক।'

'যায়গা তো, পরন্তু রাস্তা কাঁহা, মালুম নেই। অনধেরে মে খো গয়া।'

'সর্বনাশ, তুমি পথ চেনো না?' পরমা কোনো উত্তর দেয় না। দেবেই বা কী। ওরাও এখানে খুব বেশি দিন আসেনি। মাত্র কয়েক মাস হলো। সে এখানকার বিশেষ কিছুই জানে না। অবশ্য এখানে চেনার আছেই বা কী। সবই এক রকম মনে হয়।

ততক্ষণে অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এসেছে। কেউ কারোকে দেখতে পাচ্ছে না। হাত ধরাধরি করে তারা অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে এগোতে থাকে। যে করেই হোক এখান থেকে তাদের বেরোতেই হবে। হঠাৎই পরমা ভয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। তার কান্না কানে যেতে হোমসের বুকের ভিতর গভীর একটা ভয় নেমে আসে। সে বুঝতে পারে অন্ধকারে তারা একই পথে বারবার ঘুরে মরছে। বন থেকে বেরোনো সহজ নয়। তবুও পরমার হাত ধরে অন্ধের মতো সে এগিয়ে চলে।

কিসে যে পা জড়িয়ে দু'জনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বুঝতে পারে না। আর তখনই নাকের ওপর ভিজে মিষ্টি গন্ধ মাখানো কী একটা চেপে বসে। বেশিক্ষণ নয়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর একটা ঘুমের আবেশ নেমে আসে চোখ জুড়ে।

কতক্ষণ তারা ঘুমের গভীরে তলিয়ে ছিল তা জানার কথা নয়। ধীরে ধীরে হোমসের চেতনা ফিরে আসতে শুরু করে। একটু একটু করে চোখের ভিতর ও মনের গভীরে আলোগুলো ফুটে উঠতে শুরু করে। আলোর বৃত্ত চোখের সামনেও ভেসে উঠতে থাকে। সেই সঙ্গে বুঝতে না পারলেও একটা জড়ানো কথা তার কানে আসে। চোখ খুলে প্রথমেই তার নজরে আসে মশালের আলো। এ ধরনের আলো সে আগে কখনও দেখেনি কিন্তু তা বলে চেনে না তা নয়। সিনেমা বা টিভিতে বহুবার সে এই আলো দেখেছে।

হুঁশটা ভালভাবে ফিরতে হোমস আবিষ্কার করে, তার দুটো হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। পা দুটোরও একই অবস্থা। সে কাত হয়ে ভিজে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে, মানে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার বুঝতে অসুবিধা হয় না, একটা ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পড়েছে কিন্তু বিপদটা যে কী তা সে জানে না।

হোমস বরাবরই সবার কাছে শুনে আসছে সে ধীরস্থির প্রকৃতির। সহজে ভয় পায় না বা উত্তেজিত হয় না। তাই এই বিপদের মধ্যেও সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে, একের পর এক প্রশ্নের উত্তর পেতে চেষ্টা করে—এখানে সে এলো কী করে? তার হাত-পাই বা বাঁধা কেন? কারাই বা বাঁধলো আর কেনই বা বাঁধলো! এরপর তাকে নিয়ে এরা কী করবে? এই জায়গাটাই বা কোথায়? যাদের জড়ানো দু'চারটে কথা কানে আসছে তারাই বা কারা?

আর তখনই তার ধীরে ধীরে সব কিছু মনে পড়তে শুরু করলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সব কিছু। পরমার কথাও। পরমার কথা মনে পড়তে সে তাকে খুঁজতে থাকে। সে দেখতে পায় একটা নয়, দু' দুটো মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় বনের সামান্যই দেখা যাচ্ছে। অল্প একটু জায়গা। বেশ পরিষ্কার। তার বাইরে গাছের নিচে চাপ চাপ অন্ধকার। অন্ধকারের বুকে জোনাকির আলো মিটমিট করে জ্বলছে। সেই সঙ্গে একটানা ঝিঁঝির ডাক।

ঘাড়টা সামান্য বেঁকিয়ে বাঁদিকে তাকাতেই তার রক্ত হিম হয়ে গেল। সামনেই তেল-সিঁদুর মাখানো বলির হাড়িকাঠ। হাড়িকাঠে পশুবলি দেখেছে সে বেশ কয়েকবার। হাড়িকাঠের গায়ে দাঁড় করানো আছে তেল-সিঁদুর মাখানো বিরাট এক খাঁড়া।

হাড়িকাঠের ওপাশেই লোক দুটোকে দেখতে পেল। রক্তরাঙা কাপড় পরা লোক দুটো মানুষের মাথার খুলির পাত্রে বারবার চুমুক দিয়ে একটু একটু করে কী যেন পান করে চলেছে। লোক দুটোকে তার একদম ভাল লাগলো না। কেমন যেন নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর বলে মনে হলো।

হোমসের মনে হলো, এরাই বোধহয় কাপালিক। যদিও সে এর আগে চাক্ষুষ কোনো কাপালিক দেখেনি, তবে গল্পের বইয়ে সে কাপালিকের বর্ণনা পড়েছে। কিছুদিন আগে কপালকুণ্ডলা সিনেমাতে সে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর এক কাপালিক দেখেছিল। তার চিনতে ভুল হয় না। সে বুঝতে পারে, সত্যিই এক ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে সে পড়েছে। সে মড়ার মতো পড়ে থেকে আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে অন্যদিকটা লক্ষ্য করতেই পরমাকে দেখতে পেল। তাকেও পিছমোড়া করে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছে। সে একদম নেতিয়ে পড়ে আছে। বোঝাই যায় তারও জ্ঞান নেই।

পরমার জন্যে হোমসের বড় মায়া হলো। সে আবার ঘাড় ঘুরিয়ে কাপালিক দুটোকে আর একবার দেখলো। তারা এক মনে মাথার খুলিতে চুমুক দিয়ে চলেছে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো নাকের ঝাঁঝালো গন্ধটা ওখান থেকেই আসছে।

'বোম্ কালী চামুণ্ডা করালী।' হোমসের বুকের ভিতরটা ধক করে ওঠে। হৃৎপিণ্ডটা যেন এক লাফে গলার কাছে এসে আটকে যায়। সেই বিকট চিৎকারে, দুটো পেঁচা ভয় পেয়ে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল। আর কাপালিক দুটোর হাতের খুলির থেকে বেশ কিছু পানীয় চলকে নিচে পড়তেই তারা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'বোম্ কালী চামুণ্ডা করালী।' এবার ঠিক মাথার কাছে মাটি ফুঁড়ে যেন উঠে আসে ভয়ঙ্করদর্শন বিশালদেহী আর এক কাপালিক। মাথায় বিশাল জটা, বটগাছের ঝুরির মতো তা বুক-পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে। খালি গা, কোমরের নিচে বাঘছাল। গলায়, দুই হাতের বাজু ও কবজিতে মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে রক্ততিলক। চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল টকটকে। গলার স্বর যেন মেঘের গর্জন। বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রধান কাপালিক, আগের দুটো এর চেলা।

'তোমরা বলি দুটোর দিকে নজর রাখবে। আজ মহা অমাবস্যায় মা জোড়া বলি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঠিক এগারোটা পাঁচ মিনিটে অমাবস্যা শুরু, তখনই মায়ের পূজা শুরু হবে। আমার ভক্তরাও আসবে। তা এখনও বেশ কিছুক্ষণ সময় আছে। তোমরা পূজার আয়োজন কর। আমি

ততক্ষণ মায়ের সাধনায় বসি।' চেলা দুটো মাথা নাড়ে।

কাপালিক কাছেই রাখা জালার থেকে জল নিয়ে হাত-পা ধুয়ে, একটা মশাল তুলে নিয়ে সামান্য এগোতেই মশালের আলোয় হোমস দেখতে পেল, গাছপালার আড়ালে একটা ভগ্ন-জীর্ণ মন্দির। মন্দিরের সামনের চাতালে মা কালীর মূর্তি। তেল-সিঁদুর মাখানো টকটকে লাল জিব। এই পরিবেশে মাকে ভীষণ ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

'বোম্ কালী চামুণ্ডা করালী।' কাপালিক মাটিতে মশালটা পুঁতে দিয়ে মায়ের সামনে বুক টান টান করে বসলেন। পরমুহূর্তেই ধ্যানের গভীরে ডুবে গেলেন। চেলারাও যে যার জায়গায় বসে হাতে পানপাত্র তুলে নিলো।

হোমসের বুঝতে অসুবিধা হলো না, তাদের বলি দেবার জন্যেই ধরে আনা হয়েছে। ভাবতেই তার বুকের ভিতরে গভীর শূন্যতা নেমে আসে। মায়ের কথা মনে পড়ে। মা হয়তো এতক্ষণে পাগলের মতো কান্নাকাটি করছেন। বাবার কথাও মনে পড়ে। মনে পড়লো আজ সন্ধ্যায় দেওয়ালীর বাজি ফাটানোর কথা ছিল। প্রিয়কাকু জলপাইগুড়ি থেকে বাজি আনবেন। কথা ছিল সারা বাংলো আলো দিয়ে সাজানো হবে। আর কি আলো দিয়ে সাজানো হবে! হয়তো অন্ধকারেই বসে আছেন বাবা-মা কাকু-কাকীমা। ভাবতেই বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চায় কিন্তু পরমুহূর্তে তার মনে পড়ে, তাকে বাঁচতেই হবে আর বাঁচাতে হবে পরমাকেও। যে করেই হোক পরমাকে নিয়ে পালাতে হবে।

এবার সে মনটাকে দৃঢ় করে সামান্য মাথা তুলে চারদিকটা খুব ভাল করে দেখতে থাকে। একটা মশাল সরে যাওয়ায় জায়গাটা বেশ অন্ধকার হয়েছে, তাতে তার ভালই হলো। পরমার দিকে সে আর একবার তাকালো। সে তখনও মড়ার মতো পড়ে আছে। এবার সে দেখলো, চেলা দুটো গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঝিমোচ্ছে। মনে হলো নেশাটা তাদের একটু বেশিই হয়ে গেছে। কাপালিক তখনও গভীর ধ্যানে মগ্ন। যদিও সে তার পিছনটা দেখতে পাচ্ছে তবুও বুঝতে অসুবিধা হয় না, তিনি চোখ বুজে আছেন।

এতক্ষণে নিজের কথা ভাবার সময় পেল হোমস। তার হাতজোড়া পিছমোড়া

রাস্তা কাঁহা, মালুম নেই।

করে বাঁধা, পা দুটো অবশ্য সামনের দিকে জোড়া করে বাঁধা। বাঁধার দড়ির অভাবে শুকনো লতা দড়ির মতো করে পেঁচিয়ে তাই দিয়ে তাকে বাঁধা হয়েছে। লতার দড়ি খুব একটা মোটা বা শক্ত নয়। বাঁধনও বেশ আলগা বলেই মনে হলো। পরমাকেও ঠিক একইভাবে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে।

খুব সাবধানে হাত মুচড়ে হাতের বাঁধন খোলার চেষ্টা করে সে কিন্তু ব্যর্থ হয়। বাঁধন আলগা হলেও বাঁধনের কৌশল আছে, খোলা সহজ নয়। অন্যভাবে চেষ্টা করতে হবে কিন্তু পিছমোড়া থাকায় দেখাও যাচ্ছে না। তবুও যতটা সম্ভব ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই নজর পড়ে, ঠিক তার পিছনেই রয়েছে সদ্য কাটা গাছের গুঁড়ি। কুড়ালে কাটার ফলে গুঁড়ির ধারগুলো এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে। হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। সে পাছা ঘষড়াতে ঘষড়াতে সামান্য পিছনে সরে, গুঁড়ির ধারে হাতের বাঁধনের দড়ি ঘষতে থাকে।

দেখতে না পাবার জন্যে দড়িটা ঠিক মতো পড়ছে না। হাতের চামড়া বারবার ছড়ে যাওয়ায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হলো। হোমস অনুভব করে হাত কেটে রক্ত পড়ছে তবুও সে কিছুতেই হার স্বীকার করবে না। হার স্বীকার মানেই মৃত্যুর হাতে নিজেকে সেই সঙ্গে পরমাকেও সঁপে দেওয়া। তা কিছুতেই সম্ভব নয়। নিজেকে বাঁচাতেই হবে, বাঁচাতে হবে পরমাকেও। সে দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে হাতের বাঁধন ঘষতে থাকে।

'বোম্ কালী চামুণ্ডা করালী।' হঠাৎ ধ্যানরত কাপালিকের বিকট হুঙ্কারে তার বুকের ভিতরটা ধক করে ওঠে। তবে কী কাপালিক তার মনের কথা জানতে পেরেছে! সে গাছের গুঁড়ির উপরেই হেলান দিয়ে

আগের মতো পড়ে থাকে।

কাপালিকের হুঙ্কার আর শোনা গেল না। কিছুক্ষণ মড়ার মতো পড়ে থাকার ভান করে আস্তে আস্তে চোখের পাতা ফাঁক করে দেখতে পেল, কাপালিক যেমন ধ্যানে বসেছিল তেমনি বসে আছে।

আপাতত ভয় পাবার কিছু নেই। ধ্যানের মধ্যে মাঝে মাঝে এরকম চিৎকার করা তার অভ্যাস। নিশ্চিন্ত হয়ে সে আবার হাতের বাঁধন ঘষতে থাকে দাঁতে দাঁত চেপে। হাতের চামড়া ছেঁড়ার যন্ত্রণাকে সে অগ্রাহ্য করে।

হঠাৎই হোমস বুঝতে পারে, হাতজোড়া তার মুক্ত। বাঁধন কেটে গেছে। তবু হাত দুটো সামনে আনে না, ভাল করে নজর করতে থাকে চেলা দুটোকে। সে দুটো তখনও ঝিমোচ্ছে। তাদের মাথা একেবারে বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে। সে বুঝতে পারে তাদের হুঁশ নেই। এদিকে কাপালিকও অন্যদিকে ফিরে ধ্যানে মগ্ন। এটাই পরম সুযোগ।

হোমস হাত দুটো সামনে আনে। কবজি থেকে তখনও রক্ত ঝরছে, সঙ্গে যন্ত্রণাও হচ্ছে বেশ তবু সে তা গ্রাহ্যে আনলো না। দ্রুত হাত-পায়ের বাঁধন খুলতে থাকে। উৎকণ্ঠা বুকের ভিতরে প্রচণ্ড ঘা দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয় কিন্তু হোমস জানে, তাকে বাঁচতেই হবে এবং বাঁচাতে হবে পরমাকে। তার সামনে সিঁদুর মাখা হাড়িকাঠ আর ভয়ঙ্কর খাঁড়া যেন মৃত্যুর হাতছানি।

দ্রুত পায়ের বাঁধন খুলে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে পরমার কাছে সরে এসে তার হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে দেয় হোমস। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারে, বাঁধন খুলে দিলেও কোনো লাভ হবে না। পরমার জ্ঞান তখনও ফেরেনি।

হোমসের সঙ্গে ছুটে পালানোর প্রশ্নই ওঠে না তার। আবার তাকে কাঁধে তুলে, হোমসের পক্ষেও পালানো সম্ভব নয়। কিন্তু এভাবে আবার ধরা পড়ারও কোনো মানে হয় না। তাকে একাই পালাতে হবে যদিও একা পালাতে মন চাইছে না। বেচারী পরমা! হোমসের দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

পরক্ষণেই মনে হলো, এখনও হয়তো কিছুটা সময় আছে। পালিয়ে গিয়ে লোকজন ডেকে আনতে পারলে পরমাকে হয়তো বাঁচানো যেতে পারে। কিন্তু ওকে ফেলে যেতেও মন চায় না, আবার বেশিক্ষণ অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। শেষবারের মতো তাকে একটা ঠেলা মারে হোমস। বৃথা চেষ্টা। কোনো সাড়া মেলে না পরমার।

সমস্ত দ্বিধা জড়তা ঝেড়ে ফেলে, আগের মতোই নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে পাশের মোটা একটা গাছের আড়ালে গিয়ে উঠে দাঁড়ায় হোমস। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারে বনের গভীরে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারে, বনের মধ্যে দৌড়ানো সহজ নয় বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে। পদে পদে বাধা। তবুও সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, যে করেই হোক তাকে প্রিয়কাকুর বাংলোয় পৌঁছাতেই হবে, বাঁচাতেই হবে পরমাকে।

কিন্তু বনের মধ্যে সে দিশাহারা। কোনদিকে যাবে সে? থেমে থাকলে তো চলবে না! প্রতি মুহূর্তে পরমা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

হোমসের চোখের সামনে ভাসে অসহায় জ্ঞানহারা পরমার মুখ, হাড়িকাঠ ও খাঁড়া। কিন্তু তার মনে একটাই প্রতিজ্ঞা—যে করেই হোক ওকে বাঁচাতেই হবে।

ধীরে ধীরে তার দেহ অবসন্ন হয়ে আসে। দম ফুরিয়ে বুক যেন ফেটে পড়তে চাইছে। গাছের লতাপাতায় পা জড়িয়ে সে বেশ কয়েকবার আছড়ে পড়ে। ঝুলন্ত নিচু ডালে বারবার মাথায় ঠোকা খেতে খেতে মাথা ক্ষতবিক্ষত। ঝোপ ঝাড়ের খোঁচায় গায়ের জামা কখন ওর অজান্তে ছিঁড়ে খুলে গেছে তা ওর খেয়াল নেই। সারা শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘাম আর রক্ত। তবুও সে দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছে এক চিন্তা নিয়ে, পরমাকে বাঁচাতেই হবে।

ঠিক এই সময়ই তার কানে ভেসে আসে রেডিওর গান। পরক্ষণে চোখের সামনে ভেসে ওঠে আলো। ক্রমে পরিষ্কার ফুটে ওঠে, সামনেই কয়েকটা কাঠের বাড়ি। হোমস উপলব্ধি করে, তার শরীর আর চলছে না। সে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে ওঠে কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্বর বের হয় না। আবার সে চিৎকার করে ডাকতে চেষ্টা করে কিন্তু তা গোঙানির মতো শোনায়। হঠাৎ দেহটা টলে ওঠে। মাথা ঘুরে হয়তো পড়েই যেত কিন্তু তাকে পড়লে চলবে না। পরমার জীবন-মরণ তার হাতে। তাকে বাঁচাতেই হবে। যে করেই হোক তাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হবে। তা নইলে পরমাকে বাঁচানো যাবে না।

এবার তার ইচ্ছাশক্তি তার দুর্বল শরীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ছুটে চলে বাড়িটার দিকে। সে উন্মাদের মতো কাঠের বারান্দায় দুমদাম আওয়াজ তুলে বন্ধ দরজার ওপরে আছড়ে পড়ে।

'কে! কে বাইরে?' ভিতর থেকে পুরুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। কিন্তু জবাব দেবার ক্ষমতা হোমসের নেই, তার গলা থেকে শুধু গোঙানি বেরিয়ে আসে। তারপরেই আবার সেই শব্দহীন অন্ধকার জগতে তলিয়ে যায়।

চোখে-মুখে জলের ঝাপটা পড়তেই, ধীরে ধীরে আবার সে ফিরে আসে আলো ও শব্দময় জগতে। প্রথমেই চোখের সামনে ফুটে ওঠে বর্ণময় আলোর জাল। তারপর আলোর জালের সুতোগুলো পরস্পরে মিলিত হয়ে এক একটা আকারের রূপ নিতে থাকে। প্রথমেই যে রূপটা আকার নিলো তা যেন মায়ের রূপ। পাশে পাশে আরো কয়েকটা।

'মা।' হঠাৎই অস্পষ্ট স্বরে মা ডাক বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে।

'এখন কেমন লাগছে বাবা?' সে যেন ঠিক মায়ের গলাই শুনতে পেল।

'জ্ঞান ফিরেছে।' পাশ থেকে আর একজনের গলা শোনা গেল।

'এখন কেমন লাগছে বাবা?' হোমস বুঝতে পারে ইনি তার মা নন তবে মার মতোই স্নেহ মাখানো কথা বলেন।

'আমি, আমি কোথায়?' সে উঠে বসার চেষ্টা করে।

'এইতো এখানে, আমাদের কোয়ার্টারে তুমি। এখন উঠো না। ভয় কী? আমরা তো আছি।'

'আপনারা কারা?'

'আমি এখানকার ডেপুটি রেঞ্জার। তুমি এই রাতের অন্ধকারে বনের মধ্যে কী করে এলে?' এতক্ষণে গৃহকর্তা কথা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে পরমার কথা মনে পড়ে গেল হোমসের।

'পরমা! পরমা কোথায়? ওকে ওরা মেরে ফেলেছে? এগারোটা কি বেজে গেছে?'

'কে পরমা! তাকে কারা মেরে ফেলবে?'

'এগারোটা পাঁচ কি বেজে গেছে?'

'না, এখনও বাজেনি।'

'বাজেনি! তাহলে পরমা এখনও বেঁচে

আছে। ওকে বাঁচান। আপনারা ওকে বাঁচান। এগারোটা পাঁচ বাজলেই ওরা ওকে মেরে ফেলবে।' হোমস কাতর কণ্ঠে আবেদন করতে করতে জোর করে উঠে বসার চেষ্টা করে। তার দুই চোখে জলের ধারা নেমে আসে।

'কে পরমা? কী হয়েছে তার। এগারোটা পাঁচ বাজলে কারা তাকে মেরে ফেলবে? কেনই বা মারবে?' ভদ্রলোকটি জানতে চাইলেন।

সেই মায়ের মতো মহিলাটি কখন যেন বেরিয়ে গিয়েছিলেন ঘর থেকে। তিনি এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে এবার ঘরে এলেন।

'এটুকু খেয়ে নাও বাবা।' বলে তিনি গ্লাসটা তার মুখের সামনে ধরলেন।

'ওরা যে পরমাকে মেরে ফেলবে ততক্ষণে।'

'ওরা কারা? কেনই বা মেরে ফেলবে?' ভদ্রলোকটি আবার জানতে চাইলেন, কিন্তু হোমসের আর কথা বলার মতো অবস্থা নেই। সে হু হু করে কাঁদতে থাকে।

'দাঁড়াও, ওকে দুধটুকু খাইয়ে দিই তারপর যা জানবার জেন।' মহিলাটি সস্নেহে তার পিঠের ওপর হাত রেখে মুখের সামনে দুধের গ্লাসটা ধরে বললেন, 'তোমার কোনো ভয় নেই বাবা। পরমাকে কেউ মেরে ফেলতে পারবে না, উনি এই বনের কর্তা, পরমাকে উনি ঠিক বাঁচাবেন। এখনও এগারোটা পাঁচ বাজতে বেশ কিছু দেরি আছে। ততক্ষণে দুধটুকু খেয়ে ওনাকে সব খুলে বল। তা নইলে উনি বুঝবেন কি করে আর পরমাকে বাঁচাবেনই বা কি করে।'

মহিলার কথায় কাজ হলো। তাছাড়া সেই দুপুরের পর এখনও পেটে কিছুই পড়েনি। সারা সন্ধ্যায় শরীরের ওপর ধকল তো কিছু কম পড়েনি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুধটুকু খেয়ে সে জানতে চাইলো, 'এখন ঠিক ক'টা বাজে?'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোকটি জানালেন, 'ঠিক সাড়ে দশটা।'

'তাহলে এখনও পরমা বেঁচে আছে। কিন্তু এগারোটা পাঁচ বাজলেই অমাবস্যা শুরু হবে আর তখনই ওরা পরমাকে বলি দেবে। ওকে আপনারা বাঁচান।'

'অমাবস্যা! বলি! পরমা কি তোমাদের পোষা পাঁঠা?'

'না না, পরমা পোষা পাঁঠা নয়। প্রিয়কাকুর বাংলোর মালির মেয়ে। ওরা আমাদের দু'জনকে ধরে এনেছিল বলি দেবে বলে। আমি কোনোরকমে পালিয়ে এসেছি কিন্তু ও পারেনি, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ওরা নিশ্চয়......' কান্নায় কথা জড়িয়ে যায়।

'সে কী! ওরা তাহলে এই বনেই এসেছে!'

'ওরা কারা গো?'

'বেআইনী শিকারী আর কাঠ-চোরাচালানদারেরা অসম থেকে কয়েকজন তান্ত্রিক এনেছে গোপনে পুজো করবে বলে, সে খবর আমাদের কাছে আছে। কিন্তু ওরা যে আমার বিটেই এসে ঘাঁটি গেড়েছে তা তো জানতাম না। তার ওপর শুনছি মানুষ বলি দেবে! এ তো ভয়ঙ্কর কথা! আমার গার্ডগুলো কি কোনো খবরই রাখে না! যত্ত সব অপদার্থের দল!'

হোমস আপন মনেই বলে চলে, 'ওরা তিনজন কাপালিক অমাবস্যা শুরু হলেই আমাদের বলি দেবে বলে ধরে রেখেছিল। আমি পালিয়ে এসেছি কিন্তু পরমার জ্ঞান ফেরেনি বলে পালাতে পারেনি।'

'ওগো, কী সব্বোনেশে কথা গো! মায়ের নামে এ কী অনাসিষ্টি কাণ্ড! ওগো তোমরা মেয়েটাকে বাঁচাও। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। তুমি এক্ষুণি যাও।'

'যাবো তো বটেই কিন্তু এতোবড় বিটের মধ্যে ওঁদের খুঁজবো কোথায়?'

'যে করেই হোক খুঁজে বার কর।' ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, 'এদিকে অমাবস্যা লাগতেও আর দেরি নেই।'

'তুমি সেই জায়গা দেখলে চিনতে পারবে?' হোমসের কাছে জানতে চাইলেন রেঞ্জার সাহেব।

'একটা ভাঙা মন্দির, মাথায় গাছ গজিয়েছে। সামনে কয়েকটা গাছ নতুন কাটা হয়েছে; মনে হয় আজকালের মধ্যেই।'

'তোমার কথা শুনে মনে হয়, ভবানী ডাকাতের মন্দিরের কথাই বলছো এবং তা খুব একটা দূর নয়। বাহাদুর, বাহাদুর।' হঠাৎ তিনি ডাকতে ডাকতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সামান্য দূর থেকে বাহাদুরের সাড়া পাওয়া গেল, 'জী সাহাব।' তারপরেই এক স্বাস্থ্যবান নেপালী ঘরে ঢুকে সেলাম জানায়।

'চোরাচালানদারেরা সেই কাপালিকদের ভবানী ডাকাতের মন্দিরে এনে রেখেছে। সেখানেই নাকি আজ ওদের পুজো হবে, সঙ্গে নরবলিও দেবে। এদের দু'জনকে ধরে এনেছিল, এ পালিয়ে এসেছে। কিন্তু এর সঙ্গী একটা মেয়ে পালাতে পারেনি। এক্ষুণি না গেলে মেয়েটাকে বাঁচানো যাবে না। তুমি ফরেস্ট গার্ডদের রেডি হতে বল। আর দেখ তো, এই ছেলেটাকে আগে কখনও দেখেছো কিনা। কোনো ফরেস্টবাবুর ছেলে বলে চিনতে পারো?'

বাহাদুর কিছু বলার আগেই হোমস বলে ওঠে, 'আমরা প্রিয়কাকুর বাংলোয় গতকাল এসেছি।'

'প্রিয়কাকু! মানে ডি. এফ. ও. সাহেবের বাংলো! তুমি কি ডি. এফ. ও. সাহেবের আত্মীয়? পরমা, পরমা কে?'

'প্রিয়কাকুর বাংলোর মালির মেয়ে।'

'আই সী, তামাঙের মেয়ে! বাহাদুর এখনই পদমকে সাইকেলে সাহেবের বাংলোয় পাঠিয়ে জানিয়ে দাও, তাঁদের ছেলেটি আমাদের কাছে আছে। তামাঙের মেয়ের বিপদের কথাও জানাতে বলো। আর জীপটা বার করো।'

'জী সাহাব', বলে বাহাদুর ছুটে বেরিয়ে যায়।

হোমসের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে

তিন সত্যসন্ধানী শান্তনু, জীমূতবাহন আর শেলী পুলিশ বটেশ্বরের হাত থেকে পালাতে গিয়ে ঢুকে পড়ল আধ-ভাঙা মিত্রবাড়িতে। একটা গাছের ডালে উঠল ওরা। তখনই দেখল দোতলার একটা ঘর বেশ পরিচ্ছন্ন ও সাজানো গুছোনো। ত্রয়ী সত্যসন্ধানীর মনে প্রশ্ন—ভাঙাচোরা বাড়ির এই ঘরে কে বা কারা থাকে? কেন থাকে? শুরু হল ত্রয়ীর অভিযান।

একটি ঘরের রহস্য ২[illegible]

অনিল ভৌমিক

এই তিন সত্যসন্ধানীর আর একটি অভিযান

পোড়াবাড়ির রহস্য ২০্

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা) লিমিটেড

করতে মহিলা জানালেন, 'একে আর নেওয়ার দরকার নেই।'

'কী দরকার!' পোশাক পরতে পরতে জানালেন রেঞ্জার।

'না না, আমাকে নিয়ে চলুন, আমি যাবো। পরমার খুব বিপদ।' হোমস অনুনয় করতে থাকে। ভদ্রলোক কয়েক সেকেন্ড তার মুখের দিকে চেয়ে মহিলার দিকে তাকালেন। হোমসের কাতর অনুরোধ শুনে তিনি আর না করতে পারলেন না। মহিলার মৌন সম্মতি পেয়ে তিনি বললেন, 'বেশ চলো। পরমার জন্যে তুমি খুব ভয় পাচ্ছো? কোনো ভয় নেই। ওর কোনো ক্ষতি হতে দেবো না।'

পোশাক পরা হলে, আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নিলেন। এই সময়ই বাইরে জীপের আওয়াজ শোনা গেল।

'বাহাদুর গাড়ি এনেছে, চলো যাওয়া যাক।' তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'ভয় নেই, মেয়েটার কোনো ক্ষতি হতে দেবো না। আর হ্যাঁ, এর গায়ে যা হোক একটা কিছু দাও।'

মহিলা তাঁর হোস্টেলে থেকে পড়া ছেলের জামা-প্যান্ট বার করে দিলেন। হোমস তা পরে প্রস্তুত হতেই তিনি হাত জোড় করে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানালেন।

জমাট বাঁধা অন্ধকারের বুক চিরে জীপের হেডলাইটের তীব্র আলো ছুটে চলেছে। বনের ভিতর জীপ চলার পথ থাকলেও তা বেশ সংকীর্ণ। গাছের ঝুলন্ত ডালপালা জীপের চালে বারবার ঝাপটা খাচ্ছে। মিনিট সাত-আট চলার পর জীপ দাঁড়িয়ে গেল।

'সাহাব, গাড়ি আওর নেহি যায়গা। যানেকো রাস্তা নেহি।'

'ঠিক আছে, হেঁটেই যাব। জীপে যাওয়া আর উচিতও নয়, ওরা সাবধান হয়ে যাবে। বাহাদুর তুমি একে কাঁধে নাও।' হোমসকে দেখিয়ে আদেশ করলেন।

'না, না, আমাকে কাঁধে নিতে হবে না। আমি হেঁটে যেতে পারবো, আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি চলুন, পরমা......'

'আর কোনো ভয় **নেই,** আমরা এসে গেছি। এখনও হাতে বেশ কয়েক মিনিট সময় আছে।'

'আমি পালিয়েছি বলে ওরা হয়তো তাড়াতাড়ি করতে পারে।'

'এই ভয় তো আমিও করছি সাহাব।' জীপের ইঞ্জিন বন্ধ করে নেমে আসতে আসতে বলে বাহাদুর।

'তা হয় তো করবে না। অমাবস্যা না হলে তো পুজো আরম্ভই হবে না। তাছাড়া ওরা হয়তো ভাবছে অন্ধকারের মধ্যে গভীর বনে ছেলেটা রাস্তা খুঁজে পাবে না। সে যা হোক তাড়াতাড়ি চলো।' পিছনে তখন অন্যেরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে।

ওরা অভ্যস্ত পায়ে হেঁটে চললেও হোমসের খুব কষ্ট হচ্ছিলো। অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বাহাদুরের হাত ধরে সে অন্ধের মতো এগিয়ে চলে।

হঠাৎ গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মৃদু আলো দেখে ওরা আরও সতর্ক হয়। সবার আগে কুকরি হাতে বাহাদুর, সঙ্গে আর একজন। তারপরেই বন্দুক হাতে রেঞ্জার সাহেব। অন্যেরাও ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে।

চোখের সামনে থেকে শেষ ঝোপের আড়ালটা সরে যেতেই সবার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। হাড়িকাঠে পরমার গলা। তার দুই কানে জবাফুল গোঁজা। গলাতেও জবাফুলের মালা। বোধহয় স্নান করানো হয়েছে তাই সর্বাঙ্গ জবজবে ভিজে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা যদিও তার দরকার ছিল না। তখনও সে বেহুঁশ হয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে। মাথার নিচেই বড়সড় একটা মাটির মালসা, তাতে ছাড়ানো কলা একটা। মাথাটা ছিন্ন হয়ে ঐ মালসাতেই পড়বে। পাশেই এক চেলা দু'হাতে খাঁড়া মাথার ওপর তুলে প্রস্তুত হয়ে আছে, যেকোনো মুহূর্তে তা নেমে আসতে পারে। একটু দূরে কয়েকজন হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। তাদের চেহারাগুলো হোমসের ভাল লাগলো না। তার দৃষ্টি চলে যায় প্রধান কাপালিকের দিকে। কাপালিক জবাফুল হাতে মন্ত্র পড়ে সেই মন্ত্রের জল ছিটিয়ে দিচ্ছে পরমার গায়ে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে হোমস আর্তনাদ করে ছুটে যায়।

'মেরো না, মেরো না ওকে।' তার আর্তনাদে চেলাটা মুখ তুলে ওদের দেখেই খাঁড়া ফেলে ছুটে পালায়। তার দেখাদেখি অন্যেরাও অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়।

বলির বিঘ্ন হতে দেখে প্রধান কাপালিক দ্রুত হাতে খাঁড়া তুলে নিয়ে উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র পড়তে পড়তে সবেগে খাঁড়ার কোপ বসাতে যায় আর ঠিক সেই মুহূর্তে কী ঘটলো হোমস বুঝতে পারলো না। শুধু দেখতে পেয়েছিল বাহাদুর শূন্যে লাফিয়ে উঠে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়তেই সে ছিটকে একপাশে পড়ে ঘাড়ের ওপর বাহাদুরকে নিয়ে আর খাঁড়াটা পড়ে অন্য পাশে। অন্য গার্ডরা ছুটে যায়। বেঁধে ফেলে কাপালিককে। রেঞ্জার সাহেব ততক্ষণে পরমাকে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়েছেন। কাপালিক তখনও উন্মাদের মতো চিৎকার করে চলেছে।

ঠিক সেই সময় দূর থেকে হর্নের শব্দ শোনা গেল, সেই সঙ্গে মানুষজনের চিৎকার। এদিক থেকে একজন তার জবাব পাঠায়। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটা টর্চের আলো আর অনেক মানুষের গলা শোনা গেল। সবার আগে প্রিয়কাকুকে দেখা গেল, সঙ্গে পুলিশ। তারপরেই পর পর বাবা-মা, নতুন কাকী, পরমার বাবা-মা আর রেঞ্জার সাহেবের স্ত্রী। এমনকি আন্টিও এসেছেন। সবাইকে একসঙ্গে দেখে হোমসের কী যে ভাল লাগছে!

পরমার মা ছুটে এসে মেয়েকে কোলে নিয়ে কেঁদে ফেললেন। তারপর হোমসকে আদর করতে করতে নিজেদের ভাষায় কী সব বলতে থাকেন। হোমস তার বিন্দুবিসর্গও বুঝলো না।

'আপনার ছেলের জন্যেই পরমা এ যাত্রায় বেঁচে গেল।' রেঞ্জার সাহেব হোমসের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মায়ের উদ্দেশে বললেন।

মাও ছেলেকে বুকে জড়িয়ে হু হু করে কেঁদে ফেললেন। সবাই যখন হাসি-কান্নায় দুলছে তখন প্রিয়কাকুর গলা শোনা গেল। তিনি রেঞ্জার সাহেবকে অনুরোধ করলেন, 'গাঙ্গুলীবাবু, কাইন্ডলি আপনি নিজের হাতে মায়ের মূর্তিটা ভট্চাজমশাইয়ের কালীবাড়িতে নিয়ে যান। আমার নাম করে ওনাকে বলবেন, এবার যেন উনি জোড়া প্রতিমাই পুজো করেন। আরও বলবেন আমরা সবাই যাচ্ছি—সারারাত পুজো দেখে সকালে প্রসাদ খেয়ে ফিরবো। কী কিছু ভুল বললাম?' শেষের প্রশ্নটা সবার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। মহিলারা গড় হয়ে অন্যেরা হাত জোড় করে মায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন।

ছবিঃ উজ্জ্বল ধর

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

যে জামা নিজে নিজেই পরিষ্কার হয়

নোংরা বা দুর্গন্ধযুক্ত জামা পরতে কেউ ভালবাসে না। এমন জামা দেখলেই পরা তো দূরের কথা তোমাদের নাক-মুখ কুঁচকে যাবে। তাই বলছি তাড়াতাড়ি দেখা কর ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী আলেক্স ফাউলার এবং তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে। কারণ তাঁরা খুব শীঘ্র উপহার দেবেন এমন জামা যা নিজেই নিজেকে পরিষ্কার করে। ফাউলারের মতে যে ব্যাকটিরিয়াগুলি মানুষের ঘামের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে দুর্গন্ধ তৈরি করে, তাদের ব্যবহার করেই কাপড়-জামা পরিষ্কার করা যাবে। তিনি আরো বলেছেন অন্য বিশেষ কিছু ব্যাকটিরিয়াকে ব্যবহার করে ওয়াটারপ্রুফ কাপড় ও ব্যান্ডেজে ব্যবহৃত কাপড়কে যেমন পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা যাবে, তেমনি সেগুলি দীর্ঘ দিন ব্যবহারের উপযুক্ত হবে।

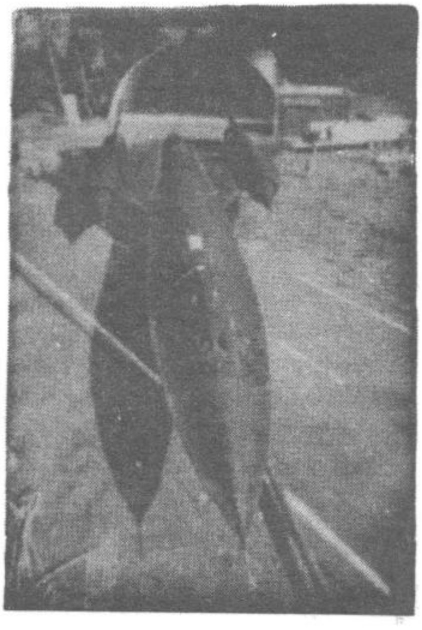

যাবে নাকি মহাকাশে?

ডেনিস টিটো তো মহাকাশে বেড়িয়ে ফিরে এলেন। এখন তিনি বেজায় খুশি। স্বপ্ন সার্থক। অবশ্য এজন্য তাঁকে কড়কড়ে পাঁচশ মিলিয়ন ডলার গুনে দিতে হয়েছে। তাঁর টাকা ছিল তাই এমন বেড়ানোটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমি বা তোমরা? হ্যাঁ, আমাদের কথাও আমেরিকার মহাকাশ সংস্থা নাসা ভাবছে। যাতে আরো অনেক কম খরচায় মহাকাশে বেড়িয়ে আসা যায় তার জন্য গবেষণা হচ্ছে।

২০০৭ সালের মধ্যেই Maglev launch assit system নামে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে ছোট ছোট মহাকাশ ফেরিযান ভ্রমণের কাজে মহাকাশে পাঠানো যাবে বলে তাঁরা বলছেন। তার জন্য খরচ পড়বে মাত্র দশ-বিশ হাজার ডলার। আরো কয়েকটা বছর অপেক্ষা করলে মাত্র কয়েক ডলারেই মহাকাশে বেড়িয়ে আসা যাবে। তাহলে মহাকাশে বেড়ানোর টিকিট কেনার জন্য টাকা জমানো আরম্ভ করা যাক। তোমরা কি বল?

সবচেয়ে দ্রুতগামী যুদ্ধবিমান

১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক শহরের ট্রেড সেন্টার গুঁড়িয়ে দেবার পর আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে আমেরিকা। এই অবকাশে দূরপাল্লার যুদ্ধের জন্য মার্কিন বিজ্ঞানীরা বানিয়েছেন এক যুদ্ধবিমান যা বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুতগামী। ধর তুমি মুম্বাই থেকে দুবাই যাও যদি এই বিমানে, তবে তোমার সময় লাগবে মাত্র আধঘণ্টা। বিমানটির নাম দেওয়া হয়েছে Sr-71 বা ব্ল্যাকবার্ড। তোমার মাথার প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার ওপর দিয়ে এই বিমান যাবে, তুমি টেরও পাবে না। Lockheed Martin Skunk Works বিমানটি তৈরি করেছেন।

মজার পাতা

নতুন শব্দমালা

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ

১. রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থ
৩. প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র
৫. সমবেত অনেক লোকজন
৭. পাপড়িতে সম্প্রদায়!
৮. এটা ফুলেরও হয় আবার ধাতুরও হয়
১০. বৃহৎ নৌকা
১২. কুকুর, আগেপিছে টিয়াপাখি
১৪. দীপ্তি, সৌন্দর্য
১৬. '—এসেছে বীরের ছাঁদে' (রবীন্দ্র)
১৭. যুদ্ধ, সেন পদবিতে বিশিষ্ট কবি
১৯. যে কবিতা গান হয়েছে
২০. বিদ্যুৎ

১		২	■	■	৩		শু ৪
	■	৫		৬	■	■	ক
■	৭		■	৮	৯	■	তা
■		■	■	■	১০	১১	রা
শু ১২		১৩	■	■	■		■
ক	■	১৪	১৫	■	১৬		
তা	■	■	১৭			■	১৮
১৯ রা			■	■	২০		

উপর-নিচ ঃ

১. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ
২. নারীর চক্ষু-প্রসাধন
৬. ধাতু উল্টে জননী
৭. দাবিয়ে রাখা
৯. বটের পাখি
১১. মণি-রত্ন
১৩. ছন্দ মিলিয়ে লেখেন যাঁরা
১৫. প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকার
১৬. বরদানকারী দুর্গা
১৮. অভিমানী

এটি তৈরি করেছেন গৌরাঙ্গ বন, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪

[সংকেত ঃ শুকতারা যেখানে আছে, সেখানে রেখেই সমাধান করতে হবে।]

এ মাসের প্রশ্ন

□ বলতে পার কি — এই ছবিটি কোন সম্রাটের, যিনি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেন?

□ ফ্যাক্স (FAX) কথাটির পুরো অর্থ কি?

মজার পাতা

নতুন ধাঁধা

১. অর্ধেক রসে ভরা
অর্ধেক ছাই
চারি বর্ণ একত্রেতে
হেরি সর্বদাই।

প্রলয় বাগচী
আসানসোল

২. বুদ্ধিহীন হতে পতি
অন্তরহীন মন্দ গতি।

দেবু, অরুণাভ
ও
গীতশ্রী চক্রবর্তী
আলিপুরদুয়ার জংশন

৩. বাদ্যের মধ্যে মাকে রেখে
ঠাট্টা করছে সবে মিলে।

গোগল সাহা
বিজয়গড়/কলকাতা

৪. একে দুয়ে দগ্ধ ইট
বাকি জলাশয়
পাঁচে মিলে ঠিকানাটা
বলুন মহাশয়।

শংকর দাশ
লোকপুর/বাঁকুড়া

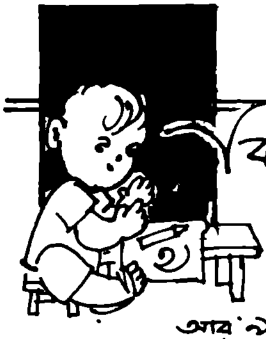

বাকির মজার অঙ্ক

বিকি তোমাদের আজ '৯'—
এই সংখ্যাটির ম্যাজিক দেখাচ্ছে,
তুমি এটা ভালো করে শিখে নাও
আর '৯' -এর ম্যাজিকে দেখাও!

ম্যাজিক১. ■ ছয় অঙ্কের যে কোন একটা সংখ্যা ধর (যেমন ৫৬৭১৩১ একটি ৬অঙ্কের সংখ্যা)

■ সংখ্যাটিকে ১০০ দিয়ে গুন কর (৫৬৭১৩১০০)

■ গুনফলথেকে মূল সংখ্যা বিয়োগ দাও (৫৬৭১৩১০০ - ৫৬৭১৩১ = ৫৬১৪৫৯৬৯)

■ এই বিয়োগফলকে প্রথমে ১১ দিয়ে ভাগ কর এবং ভাগফলকে মূল যে সংখ্যাটি ধরেছিলে তা দিয়ে ভাগ কর (অর্থাৎ ৫৬১৪৫৯৬৯ ÷ ১১ = ভাগফল ৫১০৪১৭৯ ÷ ৫৬৭১৩১ = ৯)

■ দেখ ভাগফলটি হচ্ছে ৯, এবার তুমি যে কোন সংখ্যা নিয়ে উপরের ধাপগুলি (steps) প্রয়োগ কর, উত্তর কিন্তু সবসময়ই চোখ বুজে বলতে পারবে —— ৯!

ম্যাজিক২. □ মনে মনে যে কোন একটা সংখ্যা ধর (যেমন ১২৩৪৫), সংখ্যাটি উল্টে নাও (৫৪৩২১)। এবং বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ দাও (৫৪৩২১ - ১২৩৪৫ = ৪১৯৭৬) বিয়োগফলের সংখ্যা গুলি পাশাপাশি যোগ কর (৪+১+৯+৭+৬ = ২৭), যোগফলের সংখ্যাটি ততক্ষন যোগ করতে হবে যতক্ষন না একটি সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে — আর যেটি দেখবে সবসময়ই '৯' হবে (এক্ষেত্রে যেমন ২+৭=৯)

ফুটকি থেকে ফুটকি

বৈশাখ সংখ্যার নতুন শব্দমালার উত্তর ঃ

পাশাপাশি ঃ
১. বই ২. জড্ডু ৩. খুদ ৫. বাসা ৬. মরু ৭. মৌন
১০. নহি ১১. গবা ১৩. রমা ১৫. লতা ১৬. কর
১৭. পিল

উপর-নিচ ঃ
১. বলবান ২. জনম ৪. দশানন ৮. লাড্ডু ৯. ডোনা
১০. নকল ১২. বাজার ১৪. মাতুল

বৈশাখ সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তর ঃ

১। পাইক ২। নকুল ৩। হাঁদাভোঁদা ৪। আপাদমস্তক

ফাল্গুন সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম ঃ

।। কলকাতা ।।

দেবাঙ্গনা ঘটক/শ্রাবণী আবাসন, বিধাননগর, কল-৯৭; লিজা সাহা ও শঙ্কর ভট্টাচার্য/গঙ্গোত্রী এপার্টমেন্ট, গড়িয়া, কল-৪৭; রত্না, তাপস, অভয় ও শৌভিক বসু/অটলবিহারী বসু লেন, কল-১১; রতনদা, অজয়, স্বপন, দেবুদা, সজল, সঞ্জয়, পার্থদা, বিশ্বনাথদা, সেনদা ও বুবাই/শিয়ালদহ, কল-৯; সিন্টু, মুসতারশীদ, তাহের, লীলা, রোশায়েদ, সাইফুদ্দিন, আফতাব, দাদু, বুম্বা, সেলিম নাটু/এম. এস. আলি রোড, কল-২৩; টাবু, যীশু, গোগল, কৃষ্ণগোপাল, মালা, বিভা, শোভা ও মিহির সাহা/বিজয়গড়, কল-৩২;

।। হাওড়া ।।

মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী ও শতাব্দী মুখার্জী/গণেশ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর; সৌম, সৌরভ ও সোনালি ব্যানার্জী/বি. বি. হালদার লেন, শিবপুর; বুম্বা ও ডোরা মুখার্জী/বিনোদবিহারী হালদার লেন, শিবপুর; রমা ও দেবাশিস সরকার ও অনুষ্কা ভঞ্জ/প্রসন্ন দত্ত লেন, শিবপুর;

।। হুগলী ।।

অভিজিৎ, অনিন্দিতা, ডোলু, উজ্জ্বল, শুভাশিস, নিবেদিতা, সিঞ্চিতা, অনিন্দ্য, ঋতুপর্ণা, অনন্য ও ঋতব্রত/আর. জি. নগর/হিন্দমোটর; পারমিতা, আগমনী, মৃত্যুঞ্জয়, ভীষ্ম, বাপ্তি, অপর্ণা, পুকুনি, অভিজিৎ ও সজলদা/বিবেক পল্লী, শেওড়াফুলী; সুদীপ্ত, সুদীপা, অরিত্র ও সুকন্যা সেনগুপ্ত/দে পাড়া লেন, চুঁচুড়া;

।। বর্ধমান ।।

অভীক ও অন্তরা বাউরী/শান্তিপথ, সি-জোন, দুর্গাপুর-৫; দেবাংশি, চৈতালি, প্রতিমা, গৌরব, শিল্পী, সিজার ও দেবাশিস বিশ্বাস/কল্যাণপুর হাউসিং, ধাদকা; তপন, রীনা ও ঋতুপর্ণা মুখার্জী/শাঁকতোড়িয়া; পীযূষ, জয়শ্রী ও প্রলয় বাগচী/কল্যাণপুর, আসানসোল;

।। বাঁকুড়া ।।

দেবতনু, দেবিদাস, পুতুল ও তৃণা ব্যানার্জী/দিগপাড়; মা, বাবা ও জয়দীপ রায়/উখড়াডিহি; দেবলীনা বিশ্বাস/আইস বাজার, বিষ্ণুপুর; শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু, সিতাংশু, সৌরাংশু ও স্নেহাংশু/মটুকবনী; ডলি, বকুল, মুকুল ও দেবিদাস ব্যানার্জী/দিগপাড়; ডাঃ রামপ্রসাদ ধঁক ও দেবিদাস ব্যানার্জী/চাতরার মোড়, দাসদীঘি; সুভদ্রা, আরতি ও শিউলি নায়ক/গঙ্গাজল- ঘাটী; শ্রাবন্তী, হৈমন্তী, অর্ণব, দীপা ও বিশ্বদেব বটব্যাল/ভক্তাবাঁধ; শীতল, রাধা, সমীর, বেলা, মলয় ও ললিতা বটব্যাল/ভক্তাবাঁধ; তনুশ্রী ও শ্রেয়সী ব্যানার্জী/জুনবেদিয়া; দাদু, বাবা, মা, প্রীতিসুন্দর ও প্রেমসুন্দর বটব্যাল/ভক্তাবাঁধ; শ্যামাপদ, বিশ্বনাথ ও সুনীল টুডু এবং জয়ন্ত হাঁসদা/উখড়াডিহি আদিবাসী আশ্রম হোস্টেল, উখড়াডিহি; আকাশ, বাণী, শুভম, অসীম ও লক্ষ্মী বটব্যাল, দীপ ও দুর্বা ব্যানার্জী/ভক্তাবাঁধ; দাদু, বাবা, মা, শীলু, মিলু ও তিলু/ভক্তাবাঁধ; কল্যাণ, জয়শ্রী ও অদিতি শাখা/রামসাগর;

।। মালদহ ।।

সন্দীপন ঘোষ ও সৌরভ লালা/সাহাপুর; নয়ন কুমার সরকার/নাগেশ্বরপুর; অসীম দে ও অনিল প্রামানিক/সাহাপুর;

।। মুর্শিদাবাদ ।।

দিয়া, রূপা, বেবি, শিল্পী, চিণ্টু, বুবু, ঠাম্মা, বাবা ও সিজার/গোরাবাজার, বহরমপুর; অরুণ, সঙ্গীতা, দেবদ্যুতি ও দুর্বাদল দাস/এ. সি. রোড (পূর্ব), খাগড়া; পিউ ও মৌলী গুপ্ত/শ্রীঅরবিন্দ পল্লী, রঘুনাথগঞ্জ;

।। ২৪ পরগনা ।।

দেবাশিস, শুভাশিস, সমু, সুমি, মধুছন্দা, যীশু, টুলু, মা ও বাবা/নিবেদিতা পল্লী, বারাসাত (উঃ); পরশ, মামণি, পবন, টুটুল, রানী, লিলি, দীপ, কুশাল, বিলাস, দোয়েল, আমন, বুল্টি, বন্দনা ও রাজা/সিঁথিপাড়া, বারাসাত (উঃ); রোকেয়া, রানু, চম্পা, জাহির, সাবির, হাফিজুল, রীনা, পিংকি, গুড়ো, খুকু, মণি, নিজাম, সাহিল, হাসানুর, ইমজামাম, খাদিজা, ফারুজ, খোকন ও হালি/খামারপাড়া, তারাসুনিয়া (উঃ); মুক্তো, মুন্না, ডলি, রীনা ও পিন্টু/জামিরগাছি, ভাঙড় (দঃ);

।। নদীয়া ।।

বাঁধন, পাপড়ি ও খন্দকার আব্দুল মোনেম/কৃষ্ণগঞ্জ;

বিচিত্র খবর

প্রবীর কুমার মৈত্র

ভাষার যন্ত্র

বিদেশে গিয়ে ভাষা বুঝতে না পেরে অসুবিধায় পড়েছেন? আর চিন্তা নেই। এই সমস্যার কথা মাথায় রেখে সম্প্রতি জাপানের বিজ্ঞানীরা একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এটির নাম হলো ল্যাংগুয়েজ ল্যাব (Language Lab)। পকেট সাইজের এই যন্ত্রটিতে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু ভাষা অনুবাদ করে রাখা আছে। এই সমস্ত ভাষার মধ্যে আছে জাপানি, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ইংরেজি, ফরাসি আর ইতালীয়। যন্ত্রটিতে ২২,০০০-এর বেশি শব্দ সঞ্চয় করে রাখা যাবে।

এই যন্ত্রটিতে একসঙ্গে তিনটি মেমোরি ক্যাপসুল ভরে রাখার ব্যবস্থা থাকার ফলে একসঙ্গে যে কোনও তিনটি ভাষায় এটি অনুবাদক হিসাবে কাজ করতে সক্ষম। দরকার ছাড়া অবসর সময়ে এটি কাজ করে ক্যালকুলেটরের মতো। মৈত্রীর মেলবন্ধনে এই যন্ত্রটি হয়তো অদূর ভবিষ্যতে মানুষে মানুষে বন্ধুত্বে ভাষার অন্তরায় দূর করতে পারবে।

সেজ পিসির মেজ ছেলে

হরিসাধন চন্দ্র

সেজ পিসির মেজ ছেলে
ফিরল বিদেশ ঘুরে
কত যে তার বিদ্যে-বহর
আছে মগজ ভরে।
আজব আজব ভাবনা যত
এল যে কোত্থেকে,
তাই তো দেখি কম বয়সে
চুল গিয়েছে পেকে।
বলছি যে তার খাওয়ার ঘটা
শুনছ কি মন দিয়ে?
দুপুর রাতে পোস্ত রাঁধে
কাকের মাংস দিয়ে।

মাসে দু'বার দাড়ি কামায়
শিশির জমা জলে,
হপ্তান্তর রোদ্দুরে দেয়
লিভারখানা খুলে।
রাত্তিরে রোজ নিয়ম করে
লঙ্কা ঘষে চোখে,
তাই তো এতো চোখের জ্যোতি
অন্ধকারেও দেখে।
তার সাথে কি আলাপ করার
ইচ্ছে আছে? বল।
তোমরা তবে সময় করে
আমার সাথে চল।

ঝড়ের আশা

প্রণব সেন

ফুলবাগানে ফুল যে কোথায়,
বাতাস খেলে ডালে।
আকাশ শুধু আগুন ঝরায়
জল শোকানো খালে।
ভ্রমর খোঁজে সবুজ ঘাসের
শিশিরভেজা গান।
পাখির বাসা নীরব এখন,
কোথায় কলতান।
ফসল-মাঠে কান্না ঝরায়
নীরব একা খড়,
চাতক পাখি তাকিয়ে থাকে—
আসবে কবে ঝড়।

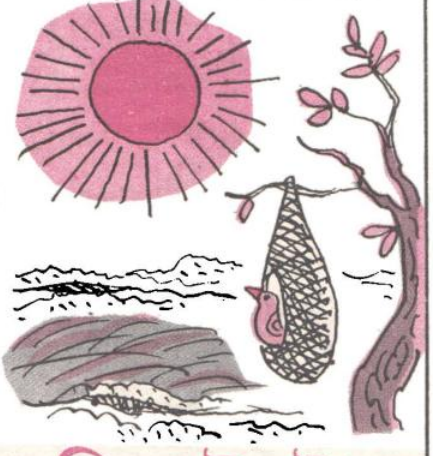

প্যাঁচার ইস্কুল

আশিস কুমার মুখোপাধ্যায়

প্যাঁচার স্কুলে পড়তে এলো
পায়রা এবং হাঁস
বলল প্যাঁচা, পড়তে হবে
নতুন 'সিলেবাস'।
প্যাঁক্-প্যাঁক্-প্যাঁক, বাকুর-কুটুম
পড়ার সে কী ধুম,
প্যাঁচামশাই পায়ের ওপর
পা তুলে দেয় ঘুম।
তবুও দেখি প্যাঁচার স্কুলে
ভালই পাশের হার
হাঁসগুলো সব 'লেটার' পেল
পায়রাগুলো 'স্টার'।

হারমোনিয়াম

সতীশ বিশ্বাস

খাচ্ছিলো বসে বসে
ফণি আর মণি আম।
এমন সময় বেজে
ওঠে হারমোনিয়াম।
খাওয়া ভুলে, দুইজনে
ছুটে যায় তক্ষুণি।
জানালার কাছে গিয়ে
পৌছালো কোনাকুনি।
তাকালো ভিতরে, ভেবে—
কেউ গলা সাধছে;
হারমোনিয়াম কোথা?
ছোট শিশু কাঁদছে।

টাক নিয়ে টুকটাক

প্রশান্ত বর্মন রায়

হোঁৎকাবাবুর টাক
চুলগুলো সব কোথায় গেল
এখন মাথা ফাঁক।

হোঁৎকাবাবুর টাক
মাথার উপর মরুভূমি
নাচছে দুটো কাক।

হোঁৎকাবাবুর টাক
টাক্ ডুমাডুম্ কাঠির বাড়ি
দুর্গা পুজোর ঢাক।

ছবি: সুফি

বিচিত্র ডাকাতি

শ্যামাপদ কর্মকার

রাজস্থান বীরের দেশ। সেখানকার কি পুরুষ কি নারী মহান কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্য হাসতে হাসতে জীবন দিতে পারত। যে সময়কার কথা বলছি সেসময় যোধপুর আর জয়শলমীর ছিল ছোট দুটি রাজ্য। মাঝখানে মরুভূমি। এই মরুভূমি ছিল বালু নামে ভয়ঙ্কর এক ডাকাতের বাসস্থান। তার এলাকায় কোনো লোক এসে পড়লে বালুর অনুগামীদের হাত থেকে সে আর রেহাই পেত না। ফলে লোকের মুখে মুখে বালুকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল নানান গল্প। কেউ বলত সে ভয়ানক নিষ্ঠুর আবার কেউ বলত সে অসম্ভব দয়ালু আর সহানুভূতিশীল।

যোধপুর আর জয়শলমীর রাজ্যের রাজারা বালুর দলকে উচ্ছেদ করার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হননি। মরু অঞ্চলের দিকে দিকে অভিযান চালানো হয়েছে, কিন্তু কোনো মতেই বালুকে ধরা যায়নি। লোকে বলে—বালু যেন চোখে ধুলো দিয়ে সব কিছু লুটে নিয়ে যায়।

জয়শলমীরের এক বড় ব্যবসায়ী গোপাললাল। তাঁর একমাত্র আদরের মেয়ে মীরা বড় হয়েছে। মেয়ের বিয়ের জন্যে গোপাললাল যোগ্য পাত্রের সন্ধান করছেন। খোঁজ পেয়ে এখানে-ওখানে পাত্র দেখতে যাচ্ছেন, কিন্তু বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। তবু মনের মতো পাত্রের খোঁজ পেলেন না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর যোধপুরের শেঠ নারায়ণ সাউ-এর ছেলে জয়দেবকে পছন্দ হলো গোপাললালের। শেঠ নারায়ণও মীরাকে দেখে খুশি হলেন। তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন, মীরা ঠিক তেমন পাত্রী। এখন দু'পক্ষই বিয়ের জন্যে জোর তোড়জোড় লাগিয়ে দিলেন। দু'জনেরই একমাত্র সন্তান, আর টাকা-পয়সারও অভাব নেই কারও।

কিন্তু গোপাললাল আর নারায়ণ সাউ—দু'জনেই বালু ডাকাতের ভয়ে আতঙ্কিত। শোভাযাত্রা করে যাওয়া-আসার পথে বালু ডাকাতের এলাকা পড়বে। তার হাত থেকে কিভাবে বাঁচা যাবে সেই নিয়েই চিন্তা ওঁদের।

এদিকে দু' জায়গার দুই বড় ব্যবসায়ীর ছেলে-মেয়ের বিয়ের খবর পৌঁছে গেছে বালু সর্দারের কানে। সে তার দলবলকে বলল, যাক, অনেক দিন পরে ভগবান এক বড় সুযোগ এনে দিয়েছেন। একদিনে বহু ধনরত্ন হাতিয়ে নেওয়া যাবে।

সময় বয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে বিয়ের তারিখ এগিয়ে এল। নারায়ণ সাউ বরযাত্রীর সঙ্গে বেশ কয়েকজন অস্ত্রধারী পাহারাদার দিলেন। যোধপুর থেকে জয়শলমীর অনেক রাস্তা। বর অবশ্য উটের পিঠে যাবে। কিন্তু বরযাত্রীদের তো হেঁটে যেতে হবে। তারপর মরুভূমির বালিতে সারাদিন হাঁটা যায় না। দিনের বেলায় যতদুর সম্ভব সতর্ক হয়ে রাস্তা চলে সকলে। সন্ধ্যা হলেই তাঁবু ফেলে বিশ্রাম নেয়। সারা রাত সতর্ক পাহারা থাকে। কিন্তু তবু নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পারে না বরযাত্রীরা। এইভাবে ক'দিন কাটল। কোনোরকম বিপদ দেখা দিল না। শেষ পর্যন্ত নিরাপদে জয়শলমীর পৌঁছাল সকলে। গোপাললাল ও তাঁর লোকেরা বর ও বরযাত্রীদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু দু'পক্ষের মধ্যে আতঙ্কের ভাব জেগেই রইল।

সব থেকে ভয়ের কথা জয়শলমীর থেকে ফেরার সময়। তখন তো বরকনের সঙ্গে থাকবে রত্নালঙ্কার আর মূল্যবান উপহার। শেঠ নারায়ণ সাউ একবার ভাবলেন, বরকনের সঙ্গে কোনো কিছু নিয়ে-যাবেন না তিনি। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার ভাবলেন ধনসম্পদ কিছু না পেয়ে হয়তো বরকনেকেই আটকে রাখবে বালুর দল।

বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। এবার

যোধপুর ফেরার পালা। গোপাললাল আর নারায়ণ সাউ পরামর্শ করে ঠিক করলেন, বরকনে ও বরযাত্রী দু'দল হয়ে যাত্রা করবে। একদল আসল আর একদল নকল। আসল বরকনে নিরাপদ ঘুররাস্তায় চুপচাপ যাবে। তাদের সঙ্গেই যাবে সব ধনরত্ন। আর নকল বরকনে নকল অলঙ্কার ও কমদামী দানসামগ্রী নিয়ে বালু ডাকাতের এলাকা দিয়ে বাজনাবাদ্যি সহকারে যাবে। বালু ডাকাতের দল যখন নকল বরযাত্রীদের উপর দাঙ্গা-হাঙ্গামা চালাবে, ততক্ষণে আসল বরকনে নিরাপদে যোধপুর পৌঁছে যাবে।

যুক্তি পরামর্শ করে ভাল কৌশল স্থির করা হলো। কিন্তু নকল বরকনে কে সাজবে? জেনে-শুনে কে আর মরণফাঁদে পা দেবে? দুই বেয়াই মিলে প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখালেন। কেউই এগিয়ে এলো না।

মীরার প্রিয়তমা সখী চন্দ্রা। বিয়ে মিটে গেছে অথচ বরকনে যোধপুর যাচ্ছে না, চন্দ্রা অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল। মীরা কোনো কথা বলতে পারে না। জলে ভরে এল ওর চোখ। শেষে চন্দ্রার পীড়াপীড়িতে সব কথা খুলে বলল মীরা।

সব শুনে চন্দ্রা বলল, আরে এর জন্যে চিন্তার কি আছে? তোর চেয়ে আপন আমার আর কে আছে? তোর জন্যে আনন্দের সঙ্গে আমি নকল কনে সাজবো।

কনে হলেই তো হবে না, একজন উপযুক্ত নকল বরও চাই। নারায়ণ সাউ-এর এক তরুণ কর্মচারী ছিল রামদেব। বুড়ি মা ছাড়া তার আর কেউ নেই। নকল বর হতে সহজেই রাজী হয়ে গেল সে। প্রভুপুত্রের সুখের জন্যে প্রাণ দিতেও পিছপা নয় রামদেব। দুই বেয়াই যেন হাতে চাঁদ পেলেন। নকল বরযাত্রীরও অভাব হলো না। নগদ টাকা মজুরি নিয়ে বাড়ির লোকদের হাতে দিয়ে এগিয়ে এল অনেকে।

বরকনে জয়দেব ও মীরা মূল্যবান ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে ঘুরপথে নিঃশব্দে যাত্রা করল। সঙ্গে কিছু বরযাত্রী ও কুড়িজন সশস্ত্র বলবান পাহারাদার।

এদিকে নকল বরযাত্রী রওনা হলো ডাকাত বালুর এলাকা দিয়ে। চন্দ্রা কনের বেশে সুসজ্জিত উটের পিঠে। সঙ্গে বরবেশে রামদেব। সেজেগুজে খুব সুন্দর দেখিয়েছে দু'জনকে। সঙ্গে তাদের নকল বরযাত্রী, নকল দানসামগ্রী নিয়ে।

চন্দ্রা কনের বেশে সুসজ্জিত উটের পিঠে।

যেমন আশঙ্কা করা হয়েছিল, ঠিক তেমনই ঘটল। নকল বরযাত্রীরা মরু অঞ্চলে পৌঁছনো মাত্রই তাদের ঘিরে ধরল বালুর দল। বরযাত্রীরা ওদের বাধা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু ডাকাতদের সঙ্গে পেরে উঠল না তারা। অনেকেই আহত হয়ে ধরা দিতে বাধ্য হলো।

পরদিন সকালে বন্দীদের নিয়ে বালু সর্দারের সামনে হাজির করা হলো। জিনিসপত্রের চেহারা দেখেই সর্দার বুঝতে পারল যে, সেগুলো সবই নকল। পিতল-কাঁসার বাসনের উপর সোনার জল চড়ানো। হার, গহনা সবই নকল মুক্তা বা পাথরের।

রাগে গর্জে উঠে সকলকে বেঁধে রাখতে আদেশ দিল বালু। ক্ষুধায়-পিপাসায় মরমর অবস্থা হলো সকলের। পরদিন ওদের সামনে এসে বালু জিজ্ঞাসা করল, সামান্য কটা টাকার জন্যে তোমরা আমায় ধোঁকা দিতে এলে? এর ফল কি হবে, তা কি জান?

কোনো জবাব দিল না কেউ। এবার বালু চন্দ্রা ও রামদেবের কাছে গিয়ে নিজের তলোয়ার হাতে নিয়ে বলল, আমাকে সত্যি করে বল তোমরা কে?

হাসতে হাসতে চন্দ্রা বলল, আমরা নকল বরকনে সর্দার। আসল বরকনে এতক্ষণ যোধপুর পৌঁছে গেছে। আমি কনে মীরার প্রিয় বান্ধবী। আর এই রামদেব শেঠ নারায়ণের বিশ্বস্ত কর্মচারী। আমাদের কাজ শেষ। এখন তুমি আমাদের গর্দান নিতে চাও তো নাও।

অবাক হয়ে ঐ রাজপুত কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বালু সর্দার। ওর পাষাণ কঠিন হৃদয়টা কি চমকে উঠল?

পরদিন যোধপুরে নারায়ণ সাউ-এর বাড়ির সামনে এক পালকি এসে থামল। বিরাট গোঁফওয়ালা এক ঢোলকবাদক ঢোলক বাজাতে বাজাতে তার সামনে। পিছনে কিছু বরযাত্রীও। অবাক হয়ে ভিড় করে এল চারপাশের অনেক লোকজন। শেঠজীর ছেলেবৌ তো আগেই এসে গেছে, তবে এরা আবার কারা? এর মধ্যে ঢোলক ফেলে কোথায় গায়েব হয়ে গেছে ঢোলকওয়ালা। বাইরে এসে নারায়ণ সাউ অবাক হয়ে দেখলেন, নকল বরকনে আসল হয়ে ফিরে এসেছে। তিনি চিৎকার করে ডাক দিলেন তাঁর বধূমাতা মীরাকে বাইরে আসার জন্যে।

ছবি: বিজন কর্মকার

সোনার পাখির সন্ধানে

ডঃ উৎপল হোম রায়

অনেক দিন আগের কথা। পাহাড়ের গায়ে এক রাজ্যে রাজা যশোবন্ত সিংহ রাজত্ব করতেন। তাঁর ছিল তিন ছেলে। রাজা বৃদ্ধ হয়েছেন তাই তিনি ঠিক করলেন তাঁর রাজ্যটিকে তিন ভাগে ভাগ করে তিন রাজকুমারকে দিয়ে যাবেন। কিন্তু সমস্যা হলো মূল্যবান মুকুটটি নিয়ে। মণি-মাণিক্য-খচিত মুকুট তো আর ভাগ করা যায় না। কাকে দিয়ে যাবেন তিনি মুকুটটি? ভেবে ভেবে একটি উপায় বের করলেন তিনি।

বেশ কিছুদিন হলো বসন্তকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি সোনার পাখি এসে রাজপ্রাসাদে বাসা বাঁধে। ভোরবেলা তার মিষ্টি-মধুর গানে রাজার ঘুম ভাঙে। সারা বসন্তকাল থেকে ঋতুরাজ বিদায় নিলে সেও প্রাসাদ ছেড়ে কোথায় যেন চলে যায়।

মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে একদিন রাজা তিন রাজকুমারকে ডেকে পাঠালেন। তারা উপস্থিত হলে তিনি বললেন, আমি বুড়ো হয়েছি। তাই ভেবেছি মৃত্যুর আগে আমার রাজ্যটি তিন ভাগে ভাগ করে তোমাদের তিনজনকে দিয়ে যাবো। কিন্তু মুশকিলে পড়েছি আমার মূল্যবান মণি-মাণিক্যখচিত মুকুটটি নিয়ে। ওটা তো আর তিন ভাগ করা যাবে না, তাই অনেক ভাবনা-চিন্তার পর আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। সেটা জানাতেই আজ তোমাদের আমি এখানে ডেকেছি।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, তোমরা নিশ্চয়ই জানো প্রতি বছর বসন্তের সময় একটা সোনার পাখি এসে আমার রাজপ্রাসাদের এক কোণে বাসা বাঁধে। বসন্তের প্রতিটি ভোরে সোনার পাখি তার মিষ্টি গানে আমার ঘুম ভাঙায়। আবার বসন্তকাল শেষ হয়ে গেলেই সে পালিয়ে যায়। কোথায় যায় তা কেউ জানে না। তোমাদের তিন রাজকুমারের মধ্যে যে সোনার পাখিটি ধরে আমাকে দিতে পারবে তাকেই আমি আমার মহামূল্যবান মুকুটটি উপহার দেবো বলে মনস্থ করেছি।

রাজকুমার তিনজন রাজার কথা শুনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর তিনজনই রাজার কাছে অঙ্গীকার করে তাদের মধ্যে একজন সোনার পাখিটি ধরে এনে রাজাকে উপহার দেবে।

এরপর শুরু হয় তাদের প্রতীক্ষা। বসন্ত শেষে কখন সোনার পাখি উড়বে। তিনজনই রাজার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে তিনটি তেজী ঘোড়া। তারপর শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা। যেদিন সংবাদ আসে সোনার পাখি উড়ে চলেছে, তিন রাজকুমারও ঘোড়া ছুটিয়ে চলে তার পিছু পিছু। একসময় সূর্য অস্ত যায়। দিনের আলো শেষ হয়ে আঁধার নামে। রাতের আঁধারে সোনার পাখি হারিয়ে যায়। দিগ্‌ভ্রান্ত তিন রাজকুমার প্রবেশ করে এক গভীর বনে। রাত্রির অন্ধকারে চলতে চলতে বনের মধ্যে তারা এসে পৌঁছে যায় এক কুঁড়েঘরের সামনে। অনেক হাঁকাহাঁকিতে কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আসে এক ন্যুব্জ বৃদ্ধ। রাত্রির ঠাঁই মেলে সেই বৃদ্ধের কুটিরে।

সকাল হলে ঘুম থেকে উঠে বৃদ্ধ তিন কুমারের সব কথা শুনে জানায়, সোনার পাখিটি কোথায় থাকে তা আমি জানি। আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো—সোনার পাখির দেশে। এই বলে বৃদ্ধ কুঁড়েঘরে ঢুকে কিছু খাবার নিয়ে আসে তিন রাজকুমার ও নিজের জন্য। আহার শেষে সে তিনটি জিনিস দেয় তিন কুমারের হাতে।

বৃদ্ধের দেওয়া একটা বড় হাতুড়ি বড় কুমার নেয়। মেজো কুমার পায় একটা দড়ির দোলা আর ছোট কুমারকে বৃদ্ধ দেয় একটা বড়সড় দড়ির বান্ডিল। তারপর তিন রাজকুমার এগিয়ে চলে বৃদ্ধের সঙ্গে।

কিছুক্ষণ চলার পর একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের কাছে বৃদ্ধ তাদের থামতে বলে। পাথরের চাঁইটা দেখিয়ে বড় কুমারকে

বলে, হাতুড়ির ঘা মেরে এটা ভেঙে ফেল। বড় রাজকুমার কয়েক ঘায়ে পাথরের চাঁইটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে। ভাঙা পাথরের নিচে দেখা দেয় বিশাল এক গর্ত। পাথরের চাঁইটা দিয়েই এতোদিন গর্তের মুখটা ঢাকা ছিল।

বৃদ্ধ দোলাটা মেজ রাজকুমারের হাত থেকে নিয়ে ছোট রাজকুমারের হাতে ধরা দড়িটা দিয়ে দোলার ওপরের দিকটা শক্ত করে বেঁধে দেয়। কাজ শেষে বলে, তোমাদের মধ্যে আগে বড় রাজকুমার দোলায় চড়ে যাত্রা করবে পাতালপুরের উদ্দেশে, সেখানেই বাস করে সোনার পাখি।

বড় রাজকুমার গর্তের মুখের কাছে গিয়ে দোলায় চড়ে বসে। তাকে উপদেশছলে বৃদ্ধ বলে, তোমার কোনও ভয় নেই। দড়ির অন্য প্রান্ত আমরা তিনজন ধরে থাকবো। পাতালে নেমে কাজ শেষ করে জোরে জোরে দড়িটা নাড়ালেই আমরা তোমাকে টেনে তুলে নেব। তবে সব সময় মনে রাখতে হবে অন্ধকার গর্তে অসতর্ক হলেই পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে প্রাণ হারাতে হবে।

বৃদ্ধের নির্দেশ মতো অতল গহ্বরে বড় কুমারের যাত্রা শুরু হলো। কিন্তু গর্তের মধ্যে কিছুটা নামার পরই চারধারের অতল অন্ধকারের আতঙ্ক তাকে চেপে ধরলো। ওপরে উঠে আসার জন্য তাই সে পাগলের মতো দড়ি ঝাঁকাতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে বড় কুমারকে টেনে ওপরে তুলে নিল অন্যরা।

দ্বিতীয় রাজকুমারের ক্ষেত্রে সেই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। অর্ধেক যেতে না যেতেই তাকেও টেনে ওপরে তুলে ফেলতে হলো। এরপরে ছোট কুমারের পালা। দোলায় উঠে ছোট রাজকুমার বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলে, দড়িটা মাঝপথে গিয়ে ছিঁড়ে যাবে না তো। বৃদ্ধ উত্তর করলে, ভয়ের কোনও কারণ নেই। যদি ভয় পেয়ে বড় ও মেজো কুমারের মতো ওপরে উঠে আসতে চেষ্টা না কর তবে তুমি গন্তব্যস্থলে নিশ্চয়ই পৌঁছুতে পারবে। সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

ছোট রাজকুমারকে নিয়ে দোলা তরতর করে পাতালে নেমে যেতে লাগলো। অন্ধকারে ছোট কুমার চুপটি করে বসে রইলো। শেষ পর্যন্ত দোলাটি পাতালের মাটি স্পর্শ করলো।

ঘোড়া ছুটে চললো ছোট রাজকুমারকে নিয়ে।

দোলা থেকে নামতে নামতে ছোট রাজকুমার দেখলো সারা জায়গাটা আলোয় ভরে আছে। একটা সরু পথ এগিয়ে গেছে গর্তের বাইরের দিকে। সেই পথ ধরে চলতে চলতে দিন শেষ হয়ে রাত্রি ঘনিয়ে এলো। তখন তার ভাবনা হলো এই অচেনা পুরে সে রাতটা কাটাবে কোথায়? শেষে পথের ওপরে একটা কুঁড়েঘর দেখে সেটার দিকে রাজকুমার এগিয়ে গেল। ছোট রাজকুমারকে দেখে একটি মেয়ে কুঁড়েঘর থেকে এগিয়ে এলো।

ছোট রাজকুমারের হাত ধরে সে তাকে নিয়ে গেল কুঁড়ের ভেতর। কাঠের পিঁড়েতে বসতে দিয়ে তাকে অনেক ফলমূল এনে খেতে দিলে। ছোট কুমার মেয়েটিকে বললো, আমি সোনার পাখির খোঁজে এসেছি। মেয়েটি উত্তর দিল, তুমি ঠিক জায়গাতেই এসেছো। আজ বিশ্রাম কর, কাল সকালে তোমার যাত্রা শুরু হবে সোনার পাখির বাস যেখানে সেই রাজপ্রাসাদের উদ্দেশে।

পরদিন ভোর না হতে মেয়েটি একটা তেজী ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত করলে রাজকুমারের কাছে। বললো ওই ঘোড়াই তাকে নিয়ে যাবে পাতালপুরের রাজপ্রাসাদে।

অনেক নদ-নদী ও প্রান্তর পেরিয়ে ঘোড়া ছুটে চললো ছোট রাজকুমারকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত তারা উপস্থিত হলো এক মনোরম রাজপ্রাসাদের কাছে।

রাজপ্রাসাদটি দেখিয়ে ঘোড়া মানুষের গলায় কথা বলে সব বুঝিয়ে দিলে রাজকুমারকে। তারপর প্রাসাদের পিছন দিকের পথ দিয়ে এগিয়ে চললো। সেখানে রয়েছে সারি সারি তেরটি অশ্বশালা পাতালপুরের রাজার। একে একে প্রতিটি অশ্বশালার কাছে পৌঁছুতেই এক একজন কর্মচারী বেরিয়ে সেখানে রাজকুমারের অশ্বটি রেখে একটু বিশ্রাম করে যেতে অনুরোধ করলে। তাদের কথা না রেখে ঘোড়াটি রাজকুমারকে নিয়ে হাজির হলো তের নম্বর অশ্বশালার সামনে। এইবার ঘোড়ার নির্দেশে তার পিঠ থেকে ছোট রাজকুমার নেমে এলো। তারপর ঘোড়াটি ঢুকে গেল সেই অশ্বশালার মধ্যে। এখানে অপেক্ষা করছিলেন পাতালপুরের রাজা নিজে। রাজকুমারকে দেখে তিনি এগিয়ে এসে বললেন, তোমার সাহস তো কম নয়। এখানে পৌঁছুনোর আগে আমার বারটি অশ্বশালার বারজন কর্মচারীকে ফিরিয়ে দিয়েছো। তাদের কথামতো কাজ করনি। তোমাকে সেবা করার কোনও সুযোগই তাদের দাওনি। আমার কর্মচারীদের অবহেলা করার জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

রাজকুমার বিনয়ের সঙ্গে উত্তর করলে, নিজের জিনিস নিজে রক্ষণাবেক্ষণ করা কি অপরাধ? আমার গন্তব্যস্থলের শেষে যেখানে আপনি নিজে অপেক্ষা করছেন সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছুনো কি আমার কর্তব্য নয় মহারাজ! এসব যদি অপরাধ হয় তো আমার বলার কিছুই নেই।

ছুরি দিয়ে মাঝখানটা কেটে ফেললো।

রাজা কুমারের সপ্রতিভ উত্তরে খুশি হয়ে বললেন, আমি জানি তুমি এখানে কেন এসেছো। তোমার সোনার পাখি চাই। আমি তোমাকে সোনার পাখি দেবো কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে। আজ তুমি খুব পরিশ্রান্ত তাই তোমার থাকার ব্যবস্থা আমার অতিথিশালায় করেছি। কাল তুমি খুব ভোরে আমার রাজপ্রাসাদে চলে আসবে। আমি রাজপ্রাসাদে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকবো। আমাকে তোমার খুঁজে বার করতে হবে। তা হলেই সোনার পাখিটি তোমাকে আমি উপহার দেবো। আর যদি তুমি আমাকে খুঁজে না পাও তবে তোমাকে আমার অশ্বশালার একজন কর্মচারী হয়ে চিরকালের জন্য বন্দী জীবন যাপন করতে হবে।

কাজটা যে খুব সহজ নয় তা বুঝতে পেরে রাতের আহারাদি সেরে অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে রাজকুমার চলে এলো তের নম্বর অশ্বশালায় তার নিজের ঘোড়াটির খোঁজে। ঘোড়াটি জেগেই ছিল, রাজকুমারকে দেখে সে এগিয়ে এলো। সব শুনে ঘোড়াটি বললে, তোমার কোনও ভয় নেই রাজকুমার। তুমি যখন সকালে রাজপ্রাসাদে যাবে তখন রাজার সাজানো বাগানের দক্ষিণ কোণে একটি আপেল গাছ দেখতে পাবে। দেখবে তাতে একটা টুকটুকে লাল আপেল ঝুলছে। সেই আপেলটা পেড়ে নিয়েই সেটা দু'ভাগ করে কেটে ফেলবে। তার মধ্যেই ছোট্ট হয়ে লুকিয়ে আছেন রাজা। এই ছোরাটা তুমি তোমার কাছে রেখে দাও, এরই সাহায্যে তুমি আপেলটা কেটে ফেলবে।

পরের দিন ভোরে ঘোড়ার কথা মতো রাজপ্রাসাদের কাছে গিয়েই দক্ষিণ কোণে আপেল গাছটা তার নজরে পড়লো। সোজা সেটার দিকে এগিয়ে গেল ছোট রাজকুমার। ঝুলন্ত লাল টুকটুকে আপেলটা পেড়ে নিয়েই ছুরি দিয়ে মাঝখানটা কেটে ফেললো। অমনি তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং রাজা। রাজা তখন রাজকুমারকে বললেন, তুমি আর একটু হলেই আমার মাথাটা কেটে ফেলেছিলে আর কি। রাজকুমার হেসে উত্তর দিল, আমি কি করে জানবো যে আপনি গাছে ঝুলন্ত এই আপেলের মধ্যে লুকিয়ে আছেন! রাজা সব বুঝে খুশি হয়ে সোনার শেকলে বাঁধা সোনার পাখিটিকে ছোট রাজকুমারের হাতে তুলে দিলেন। রাজকুমারকে রাজা বললেন, এই সোনার পাখি, তোমার ঘোড়া আর কুঁড়েঘরে দেখা মেয়েটি হলো তিন রাজকুমারী। তারা ডাইনীর মায়ায় তাদের নিজেদের রূপ হারিয়ে সোনার পাখি, ঘোড়া আর কুঁড়েঘরের মেয়ে হয়ে আছে। তোমাকে আমি এই মন্ত্রপূত সোনার কাঠিটা দিচ্ছি, এটা ওদের তিনজনের মাথায় ছোঁয়ালেই তারা তাদের পূর্বের রূপ ফিরে পাবে। তারপর তোমরা তিন ভাই নিজেদের পছন্দ মতো তিন রাজকুমারীকে বিয়ে করে সুখে দিন কাটাতে পারবে।

রাজার উপদেশ মতো ছোট রাজকুমার সোনার শেকলে বাঁধা সোনার পাখি ও মন্ত্রপূত সোনার কাঠিটা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে পাতালপুরের পথের ধারে ফেলে আসা কুঁড়েঘরটির দিকে। সেখান থেকে পাতালপুরের মেয়েটিকেও তুলে নিলে ঘোড়ার পিঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোড়া পৌঁছে গেল পাতালপুরে ঢোকার অন্ধকার গহ্বরের মুখটাতে।

রাজার কথামতো ঘোড়া ও পাতালপুরের মেয়েটিকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ফিরিয়ে দিলো তাদের আগের রূপ। আবার রাজকন্যা হলো তারা। মুক্তি পেলো অভিশপ্ত জীবন থেকে।

এরপর ওরা তিনজনে দোলায় চড়ে বসলো। শুধু ছোট রাজকুমারের হাতে সোনার শেকলে বাঁধা সোনার পাখিটি রইলো আর রাজকুমারের সঙ্গে রইলো মন্ত্রপূত সোনার কাঠিটা। নির্দেশ মতো খুব জোরে জোরে দোলার দড়িটা নাড়িয়ে দিলো ছোট রাজকুমার। অমনি দোলা উঠে গেল ওপরে তরতর করে।

ছোট রাজকুমারের সঙ্গে সোনার শেকলে বাঁধা সোনার পাখি ও সুন্দরী কন্যাদের দেখে উৎকণ্ঠায় অপেক্ষমাণ বৃদ্ধ ও দুই রাজকুমার খুবই আনন্দিত হলো। তারা ছোট রাজকুমারকে জিজ্ঞেস করে সব কথা জেনে নিলে। তারপর বৃদ্ধের কুঁড়েঘরে ফিরে এসে তাদের গচ্ছিত রাখা ঘোড়া তিনটি, সোনার শেকলে বাঁধা সোনার পাখি, বড় ও মেজ রাজকুমার আর তাদের পছন্দের দুই রাজকন্যাকে নিয়ে ছোট রাজকুমার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো পিতৃরাজ্যের দিকে।

সোনার পাখি ও দুই রাজকন্যার সঙ্গে তিন রাজপুত্রকে পেয়ে রাজার আহ্লাদ আর ধরে না। তিনি ছোট রাজকুমারের হাত থেকে সোনার পাখিটি নিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। সেই সময় মন্ত্রপূত সোনার কাঠি ছুঁইয়ে পাখিটিকে অপূর্ব এক সুন্দরী রাজকন্যায় পরিণত করলো ছোট রাজকুমার। রাজা বিস্ময়ে সব কথা শুনলেন রাজকুমারদের কাছ থেকে। পরে তাঁর রাজ্যটি সমান তিন ভাগ করে তিন রাজকুমারকে দিলেন। ছোট রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিলেন 'সোনার পাখি' রাজকুমারীর, আর অন্য দুই রাজকুমার বিয়ে করলো তাদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে আসা দুই রাজকুমারীকে। রাজা তাঁর মহামূল্যবান মুকুট দিলেন ছোট কুমারকে সোনার পাখি খুঁজে নিয়ে আসার পুরস্কার হিসেবে। রাজা যশোবন্তের মৃত্যুর পর তিন রাজ্যে তিন কুমার মনের সুখে রাজত্ব করতে লাগলো।

ছবি : সুদীপ্ত দত্ত

মন্ত্রশক্তি

পীযূষকান্তি বিশ্বাস

শত শত বছর পূর্বে উত্তর ভারতের একটি শহরে এক ব্রাহ্মণ বাস করতো। প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করে এবং পণ্ডিত ও পুরোহিতদের সংস্পর্শে এসে বহুদিন ধরে সাধনা করে সে এক বিশেষ মন্ত্রশক্তির অধিকারী হলো। আকাশে চাঁদ ও নক্ষত্রের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থানকালে সে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতো। তখন আকাশ থেকে সাতটি মূল্যবান রত্ন এসে তার হাতে পড়তো। এই মন্ত্রশক্তির কথা সে সযত্নে গোপন রেখেছিল।

কোথা থেকে সে ধন উপার্জন করতো, সে বিষয়ে যাতে কেউ তাকে সন্দেহ না করে, সেজন্য সে কখনও কখনও কিছু ছাত্র পড়াতো। তার এই গোপন মন্ত্রশক্তির কথা একজন মাত্র শিষ্য জানতো। কিন্তু কিভাবে এই মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করা যায়, শিষ্যটির তা জানা ছিল না।

একদিন ব্রাহ্মণ ও তার প্রিয় শিষ্য প্রতিবেশী একটি দেশভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। প্রথমদিন সীমান্তের কাছে একটি ছোট্ট শহরে ওরা আরামে রাত কাটালো। কিন্তু পরদিন যাত্রা আরম্ভ করতে না করতেই ওরা ঐ দেশের একটি নির্জন অঞ্চলে এসে পৌঁছলো। দু'ধারে খাড়া উঁচু পাহাড়ে ঘেরা রাস্তা দিয়ে দুজনে এগিয়ে যেতে লাগলো। প্রখর সূর্যের তাপে ওদের প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত। পরবর্তী গ্রামে গিয়ে পৌঁছতে পারলে বন্ধুভাবাপন্ন কোনো গ্রামবাসীর বাড়িতে বিশ্রাম নিতে পারবে এই আশায় ওরা হাঁটতে থাকলো। কিন্তু হায়! হঠাৎ ওরা দেখতে পেল দস্যুর একটি বিশাল দল চারদিক থেকে ওদের ঘিরে ফেলেছে। পাগড়ি দিয়ে ওদের মুখের খানিকটা ঢাকা। কারুর হাতে তলোয়ার আর কারুর হাতে ধারালো ছুরি। পালাবার চেষ্টা করা বৃথা।

বেচারা ব্রাহ্মণ ও তার শিষ্যের হাত বেঁধে দস্যুদল কিছুদূরে তাদের আস্তানায় নিয়ে গেল। ওদের কাছে তেমন টাকা-পয়সা নেই, একথা জানতে পেরে দস্যুরা ভীষণ বিরক্ত বোধ করলো। ওদের সর্দার তখন ব্রাহ্মণ ও তার শিষ্যকে বললো, 'নিয়ম অনুযায়ী তোমাদের মুক্তি-পণ হিসাবে কিছু অর্থ দিতে হবে।' এই উদ্দেশ্যে সে তরুণ শিষ্যটিকে মুক্তি দিয়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য তাকে শহরে যেতে অনুমতি দিল। যাবার আগে শিষ্যটি তার গুরুকে বললো, 'গুরুদেব, আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই অর্থ-সংগ্রহ করে ফিরে আসব। কিন্তু কোনোমতেই আপনি মুক্তিলাভের আশায় অর্থ-সংগ্রহের জন্য আপনার মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করবেন না। কেননা, দস্যুরা যদি জানতে পারে যে, আপনি মন্ত্রবলে মূল্যবান রত্ন সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলে ওরা আপনাকে কোনোদিনও আর মুক্তি দেবে না।'

ঐদিন রাতে ব্রাহ্মণ হঠাৎ দেখতে পেল, চাঁদ ও তারা ঠিক এমন জায়গায় অবস্থান করছে, যখন সে তার মন্ত্র প্রয়োগ করতে পারে। তক্ষুণি সে দস্যু-সর্দারকে

জীবন রক্ষা করতে মিথ্যা কথা বলছ।

বললো, 'আপনি মুক্তি-পণ বাবদ অর্থ-সংগ্রহ করে আনতে আমার শিষ্যকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সে আদৌ ফিরবে কিনা কে জানে! আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে মুক্তি-পণের সমান মূল্যের মণি-রত্ন দিই, তাহলে কি আপনি প্রসন্ন হবেন?' দস্যু-সর্দার রাজী হলে ব্রাহ্মণ তার হাতের বাঁধন খুলে দিতে বললো। ব্রাহ্মণের হাতের বাঁধন খুলে দেবার পর সে একটু দূরে গিয়ে তার মন্ত্র উচ্চারণ করে সাতটি মূল্যবান রত্ন সংগ্রহ করে দস্যু-সর্দারের সামনে তুলে ধরলো। ঐ রত্ন দেখে দস্যু-সর্দার আনন্দে আটখানা। দলের সবাই সারারাত আনন্দোৎসবে মেতে উঠলো। দস্যু-সর্দার ব্রাহ্মণের গুরুত্ব বুঝতে পারলো। মুক্তি না দিয়ে তাকে তাদের সঙ্গে অন্যত্র নতুন আস্তানার উদ্দেশ্যে যেতে আমন্ত্রণ জানালো। নিরুপায় ব্রাহ্মণ এই আমন্ত্রণ স্বীকার না করে পারলো না। তারপর দলটি পরবর্তী গ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ পাঁচশ দস্যুর অপর একটি দল এসে অতর্কিতে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠতরাজ আরম্ভ করলো। দিশেহারা দস্যুদের সর্দার তখন ঐ দলটির নেতাকে বললো, 'দেখ, আমরাও তোমাদের মতো লুণ্ঠনকারী। আমাদের কাছে লুঠ করা ধন-দৌলত কিছু আছে। কিন্তু সেসব তো একদিন ফুরিয়ে যাবে। তোমরা যদি অফুরন্ত ধন-দৌলত পেতে চাও, তাহলে এই ব্রাহ্মণকে বন্দী করে নিয়ে যাও। সে মন্ত্রবলে আকাশ থেকে মণি-রত্ন ঝরাতে পারে।' ওরা তখন ব্রাহ্মণকে বন্দী করে অবিলম্বে আকাশ থেকে সমপরিমাণ মণি-রত্ন সংগ্রহ করতে আদেশ দিল। ব্রাহ্মণ অনেক কাকুতি-মিনতি করে ওদের বোঝাতে চেষ্টা করলো যে, গতরাত্রেই সে তার মন্ত্র প্রয়োগ করে মণি-রত্ন সংগ্রহ করেছে। সুতরাং এক বছর পর আবার যখন চাঁদ-তারা উপযুক্ত জায়গায় অবস্থান করবে, তখনই সে তার মন্ত্র প্রয়োগ করতে পারবে। একথা শোনামাত্রই নতুন দলটির সর্দার রেগে আগুন। সে বললো, 'হতভাগা! তুমি তোমার জীবন রক্ষা করতে মিথ্যা কথা বলছ।' সে তার সঙ্গীদের ব্রাহ্মণের শিরোশ্ছেদ করতে আদেশ দিল। ব্রাহ্মণের দেহ কিছুক্ষণের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে রইলো।

এইবার দু'দল দস্যুর মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ বাধলো। মাত্র দুজন ছাড়া এই সংঘর্ষে সব দস্যুই প্রাণ হারালো। ওরা দুজন সমস্ত মণি-রত্ন সংগ্রহ করে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখলো।

দুপুরবেলায় দুজন দস্যুই প্রচণ্ড খিদের জ্বালা অনুভব করলো। খাবার আনতে একজন গ্রামের দিকে গেল আর একজন রত্ন-ভাণ্ডার পাহারা দিতে থাকলো। পাহারারত দস্যুটি ভাবলো, সে যদি খাবার নিয়ে আসবার পর ঐ দস্যুটিকে মেরে ফেলতে পারে, তাহলে গোটা ধন-ভাণ্ডারের মালিক একাই হতে পারবে। অপর দস্যুটিও মনে মনে একই কথা ভাবলো। সে ফন্দী আঁটলো যে, প্রথমে সে পেটভরে খেয়ে নেবে তারপর অপর দস্যুটির জন্য খাবার কিনে তাতে বিষ মিশিয়ে দেবে। বিষ-মেশানো খাবার খেয়ে ওই দস্যুটি মারা যাবে। সে যা ভাবলো, ঠিক তাই করলো। তারপর বিষ-মেশানো খাবার নিয়ে ঝোপের কাছে এসে পাহারারত দস্যুটিকে খাবার খেতে ডাকলো। অপর দস্যুটি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে খাবার হাতে নিয়ে অতর্কিতে তলোয়ারের আঘাতে তাকে মেরে ফেললো ও মৃতদেহটিকে ঝোপের আড়ালে সরিয়ে ফেললো। ওর পেটে তখন দারুণ খিদের জ্বালা। তাই চটপট পেট ভরে খাবার খেয়ে ফেললো। বিষ-মেশানো খাবার খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মারা গেল। তখন ঐ বিপুল ধন-ভাণ্ডার অরক্ষিত অবস্থায় ঝোপের মধ্যে পড়ে রইলো।

পরদিন শিষ্যটি তার গুরুকে মুক্ত করবার জন্য প্রয়োজনীয় মুক্তি-পণ নিয়ে ফিরে এল। দস্যুদের অসংখ্য মৃতদেহ একত্রে পড়ে থাকতে দেখে সে আঁতকে উঠলো। তার গুরুদেবের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে সে ভাবলো, হায়! উনি নিশ্চয়ই গর্বভরে ওঁর যাদু-বিদ্যার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন। তারপর সে গুনে দেখলো, মোট নয় শত আটানব্বইটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সে বুঝতে পারলো, ঐ মণি-রত্নের ভাণ্ডার হস্তগত করবার জন্যই এক মর্মান্তিক সংঘর্ষ ঘটে গেছে এবং বাকি দুজন দস্যু হয়তো পালিয়ে বেঁচেছে। কিন্তু না, কিছুদূরে সে ঐ দুজনের মৃতদেহও পড়ে থাকতে দেখলো। আরও দেখতে পেল, একটু দূরে পড়ে রয়েছে রত্নের এক স্তূপ। গভীর বেদনায় মাথা নাড়িয়ে সে ভাবলো, এত হানাহানি ঘটতে পারে শুধু কিছু রত্ন পাবার লোভে! হে ভগবান, যদি আমার গুরুদেব আমার পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন; যদি তাঁর মন্ত্র প্রয়োগ করে রত্ন সংগ্রহ করবার চেষ্টা না করতেন!

(রমিলা থাপার রচিত 'দ্য স্পেল' গল্প অবলম্বনে)

ছবি : রঞ্জন দত্ত

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

ভারতবর্ষে সর্বাধিক বিক্রীত কমিকস

ডায়মণ্ড কমিকস

এই মাসে পড়ুন

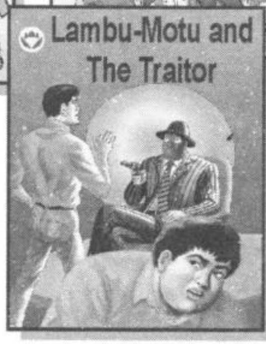

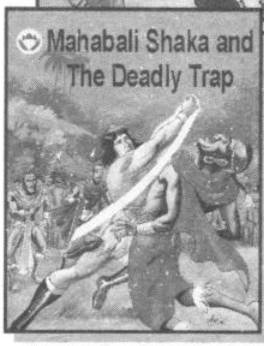

ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব -এর সদস্য হোন এবং বাড়ী বসে ৫০ টাকার কমিকস ৪৫ টাকায় নিন। ডাক ব্যয় ৬ টাকাও আর আলাদা করে দিতে হবে না। এই ভাবে প্রতি মাসে ডায়মণ্ড কমিকসের ৫টি কমিকসের সেট আপনি বাড়ী বসেই পেতে পারেন। এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশ বা ভারতের বাইরে আর কোন দেশে প্রযোজ্য হবে না। সদস্যতা কুপন ভরে পাঠাবার সময়ই সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা আপনি ডাক টিকিটের মাধ্যমে পাঠান। নিজের নাম-এবং ঠিকানা ইংরাজীতে স্পষ্ট করে লিখুন। সময়ে-সময়ে আপনাকে অন্যান্য উপহারও পাঠানো হবে। লাগাতার ১২ টি ভি পি ছাড়ালে ১৩ নম্বর ভি.পি. ফ্রী। ডায়মণ্ড পরিবারের সদস্য হোন এবং মনোরঞ্জনের দুনিয়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলুন।

এক বছরে মাস	কনশেসন (টাকা)	মোট সঞ্চয় (টাকা)
১২	৫.০০ (কনশেসন)	৬০.০০
১২	৬.০০ (ডাক খরচ)	৭২.০০
১	৫০.০০ (১৩ নং ভি.পি ফ্রী)	৫০.০০
সদস্যতা প্রমাণপত্র এবং অন্য আকর্ষক উপহার, স্টিকার এবং ডায়মণ্ড পুস্তক সমাচার ফ্রী		২০.০০
		২০২.০০

সদস্য হওয়ার জন্য আপনি কেবল নীচের কুপনটি ভরে পাঠান এবং সদস্যতা শুল্ক ১০ টাকা ডাক টিকিট অথবা মানি অর্ডারের রূপে অবশ্যই পাঠান। এই স্কীমের অন্তর্গত প্রতি মাসে ২০ তারিখে আপনাকে ভি.পি. পাঠানো হবে, যাতে ৬-টি কমিকস থাকবে।

হ্যাঁ! আমি '**ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব**'-এর সদস্য হতে চাই এবং আপনাদের দ্বারা দেওয়া সুবিধাগুলো পেতে চাই। আমি নিয়মগুলো ভাল করে পড়ে নিয়েছি। আমি কথা দিচ্ছি প্রতি মাসে ভি. পি. ছাড়িয়ে নেব।

নাম : ____________________

ঠিকানা : ____________________

পোস্ট : ____________ জেলা : ____________

পিন কোড : ____________________

সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক টিকিট / মানি অর্ডারের রূপে পাঠাচ্ছি।

আমার জন্মদিন : ____________________

নোট : সদস্যতা শুল্ক পাওয়ার পরই সদস্যতা দেওয়া হবে।

এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ অথবা অন্য কোন দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ডায়মণ্ড কমিকস প্রা. লি. 257, দরিবা কলান, দিল্লী-110 006

Registration No. Tech/W.B./RNP-93/ 2002 May "Suktara".